মুসাফিরের পাথেয়

ইমাম ইবনুল কাইয়িম رحمه الله

ফালাহ

মুসাফিরের পাথেয়

'আর রিসালাতুত তাবূকিয়্যাহ' গ্রন্থের অনুবাদ

মুসাফিরের পাথেয়

মূল

ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﵀

অনুবাদ

আবদুল্লাহ আল নোমান

সম্পাদনা

মুফতি আবদুল্লাহ জোবায়ের

জাকারিয়া মাসুদ

دار الفلاح

দারুল ফালাহ

মুসাফিরের পাথেয়

প্রকাশক :

দারুল ফালাহ

একমাত্র পরিবেশক :

৩৪, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

যোগাযোগ : ০১৭৭৯ ১৯ ৬৪ ১৯, ০১৪০৬ ৩০০ ১০০

অভিযোগ ও পরামর্শ : ০১৭১১ ০৬৯ ০৩৯

darulfalah2050@gmail.com

www.facebook.com/darulfalah2050

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০২২

অনলাইন পরিবেশক : ওয়াফি লাইফ, রকমারি.কম, বইফেরী

মুদ্রণ ও বাঁধাই : বই কারিগর

মূল্য : ১২০৳

সূচিপাতা

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা ও স্তুতি একমাত্র আল্লাহর জন্য। এর উপযুক্ত কেবল তিনিই। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর সর্বশেষ নবি ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে ইরশাদ করছেন,

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۝٢

'নেক কাজ ও তাকওয়ার কাজে তোমরা একে অপরকে সহযোগিতা করো। পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কোরো না। আর তাকওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি প্রদানে অত্যন্ত কঠোর।'[১]

আল্লাহর বান্দা হিসেবে প্রত্যেকের জীবনে দুটি বিষয় থাকে।

প্রথমত, নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক এবং এই সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব।

দ্বিতীয়ত, নিজেদের ও আল্লাহর মধ্যকার সম্পর্ক এবং এই বিষয়ক কর্তব্য।

মানুষের আচার-আচরণ হয় নিজেদের মাঝে, অথবা প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার সাথে। বান্দা এই দুই অবস্থার কোনো একটার সাথেই সব সময় জড়িত থাকে। সুতরাং সৃষ্টির সাথে বান্দার ওঠাবসা, সহযোগিতা এবং সাহচর্যগ্রহণের ভিত্তি যেন হয় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং তাঁর আনুগত্য। এটাই বান্দার সফলতা এবং সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। এই নেক কাজ ও তাকওয়াই সম্পূর্ণ দ্বীনের সমষ্টি। এ দুটি নামই একটি অপরটির বদলায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ব্যবহৃত হওয়াটা হয়তো অন্তর্ভুক্ত হিসেবে, নয়তো আবশ্যিকভাবে। তবে অন্তর্ভুক্ত হওয়াটাই বেশি প্রাসঙ্গিক। কারণ নেক কাজ যেমন তাকওয়ার অংশ, তেমনি তাকওয়াও নেক কাজের অংশ। সে হিসেবে এটা বলা যায়, আলাদাভাবে ব্যবহৃত হওয়ার সময়ও একটির মধ্যে অপরটির অস্তিত্ব থাকে। এর উদাহরণ হলো ঈমান ও নেক কাজ,

[১] সূরা মায়িদাহ, ৫ : ২

দরিদ্রতা ও রিক্ততা, পাপাচার ও অবাধ্যতা, খারাপ কাজ ও অশ্লীলতা ইত্যাদি। এখানে উল্লেখকৃত প্রতিটি জোড়বদ্ধ শব্দ একটি অপরটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি, যা স্মরণ রাখলে মনের মধ্যে আসা অনেক সংশয় নিরসন হবে। আমরা এখন নেক কাজ ও তাকওয়ার অন্য কোনো উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করব।

মূলত 'بِرٌّ' শব্দের অর্থ হলো কোনো বস্তুর কাঙ্ক্ষিত পূর্ণতা এবং কল্যাণময় উপকার। শব্দের গঠনপ্রণালী থেকে এমনটাই বুঝে আসে। আরবিতে গমকে বলা হয় 'بُرٌّ' যা একই শব্দমূল থেকে গঠিত। অন্যান্য শস্যের তুলনায় গমের উপকারিতা ও কল্যাণের আধিক্যের কারণে, এ শব্দমূল থেকে গঠন করা হয়েছে। একই শব্দমূল থেকেই গঠিত হয়েছে رَجُلٌ بَارٌّ(সৎ ব্যক্তি), بَرٌّ (মহৎ), كِرَامٌ بَرَرَةٌ (পূতপবিত্র ফেরেশতা) এবং اَلْأَبْرَارُ (নেককারগণ) প্রভৃতি। অতএব, 'بِرٌّ' তথা নেক কাজ হচ্ছে এমন শব্দ, যা বান্দার কাঙ্ক্ষিত সব কল্যাণ ও পূর্ণতার সমষ্টি। এর বিপরীতে 'إِثْمٌ' তথা 'পাপাচার' ব্যবহৃত হয় সব ধরনের মন্দ গুণ ও দোষত্রুটির সমষ্টি বোঝার জন্য। ওয়াবিসাহ ইবনু মা'বাদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এলাম। তখন তিনি বললেন,

جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ

"তুমি পুণ্য এবং পাপের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে এসেছ?"

আমি বললাম, "যে সত্তা আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, (তাঁর কসম!) এটা ছাড়া অন্য কিছু জিজ্ঞেস করতে আসিনি।" তিনি বললেন,

الْبِرُّ مَا انْشَرَحَ لَهُ صَدْرُكَ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَإِنْ أَفْتَاكَ عَنْهُ النَّاسُ

"নেকি সেটাই, যার প্রতি তোমার অন্তর পরিতৃপ্ত হয়। আর পাপ সেটা, যা তোমার মনে খটকা সৃষ্টি করে; যদিও লোকেরা তোমাকে (তার বৈধতার ব্যাপারে) ফতোয়া দিয়ে থাকে।"'[২]

নাওয়াস ইবনু সামআন ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

[২] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ১৭৯৯৯

‘নেক কাজ হলো সচ্চরিত্রের নাম। আর পাপ তা-ই, যা তোমার অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করে। এবং তা লোকে জেনে ফেলুক—এ কথা তুমি অপছন্দ করো।’[৩]

মোটকথা, পাপ হলো এমন শব্দ, যা সব ধরনের মন্দ কাজ এবং নিন্দনীয় চরিত্র বুঝিয়ে থাকে।

সে হিসেবে ঈমানের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল শাখা নেক কাজের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক আমলের সাথে জড়িত সবকিছুই নেক কাজের অন্তর্ভুক্ত। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেক কাজ বলতে অন্তরের সততা বোঝায়। ঈমানের স্বাদ লাভ করা, যাবতীয় আত্মিক ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকা, প্রফুল্লতা অনুভব করা, ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হওয়া, ঈমানী সজীবতা অনুধাবন করা ইত্যাদি। ঈমানের এক ধরনের মিষ্টতা রয়েছে। যার অন্তর সেটা অনুভব করতে পারে না, সে হয়তো বেঈমান নয়তো তার ঈমান কমজোর। সে ওই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ وَلَٰكِن قُولُوٓا۟ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَٰنُ فِى قُلُوبِكُمْ ۖ

‘বেদুঈনরা বলল, “আমরা ঈমান আনলাম।” বলো, “তোমরা ঈমান আনোনি।” বরং তোমরা বলো, “আমরা আত্মসমর্পণ করলাম।” আর এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি।”’[৪]

বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী ওইসব লোকেরা নিফাকমুক্ত মুসলিম, তবে মুমিন নয়। তাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি যে, তারা এর হাকীকতের সংস্পর্শে আসতে পারবে কিংবা এর স্বাদ অনুভব করবে। আল্লাহ তাআলা নেক কাজের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নোক্ত আয়াতে একত্রিত করেছেন,

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ

[৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৫৫৩

[৪] সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৪

أُولَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

'নেক কাজ শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ ফেরাবে, বরং বড় নেক কাজ হলো ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর, কিয়ামাত দিবসের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর এবং নবিগণের ওপর, আর তাঁরই মহব্বতে সম্পদ ব্যয় করবে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম-মিসকিন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। আর যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং ওয়াদা করলে ওয়াদা রক্ষা করে এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী, তারাই সত্যবাদী, আর তারাই মুত্তাকি।'[৫]

আল্লাহ তাআলা এখানে নেক কাজের সংজ্ঞায় ঈমানের বিষয় এবং আমলগত বিষয়ও উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, নবি-রাসূল এবং আখিরাতের প্রতি ঈমানের আনার কথা প্রথম অংশে বলা হয়েছে। এ বিষয়গুলোই ঈমানের পাঁচ মূলনীতি; যার ওপরে ঈমান দাঁড়িয়ে আছে। এরপর এসেছে বাহ্যিক আমলগত বিষয়গুলো। সালাত, যাকাত এবং আবশ্যক খরচাদি ইত্যাদি বাহ্যিক আমলও এর মধ্যে শামিল। পাশাপাশি সবর, ওয়াদা পালনের মতো অন্তরের আমলও রয়েছে। সুতরাং এই বৈশিষ্ট্যগুলো দ্বীনের বাহ্যিক বিধিবিধান, অন্তরের বিষয়াদি সকল প্রকারকেই অন্তর্ভুক্ত করেছে। এরপর আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তাকওয়ার বৈশিষ্ট্যও এগুলো। অর্থাৎ এখানেও তাকওয়া আর নেক কাজ সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আল্লাহ বলছেন,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

'তারাই সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই তাকওয়াবান।'

[৫] বাকারাহ, ২ : ১৭৭
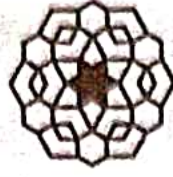
তাকওয়ার পরিচয়

ঈমানের সাথে ও আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে প্রতিদানের আশায় করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ে তাঁর আনুগত্য করা। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার আদেশের ওপর ঈমান রেখে, আল্লাহর ওয়াদার প্রতি আস্থা রেখে, তাঁর বিধিবিধান বান্দা পূর্ণ করবে। আর আল্লাহ তাআলার নিষেধাজ্ঞার ওপর ঈমান রেখে, আল্লাহর শাস্তির প্রতি ভয় রেখে, তাঁর নিষেধকৃত বিষয়গুলো বান্দা পরিত্যাগ করবে।

ত্বলক ইবনু হাবীব বলেন, 'ফিতনাকে তাকওয়ার মাধ্যমে প্রতিহত করবে।' লোকেরা বলল, 'তাকওয়া কী?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ-প্রদত্ত নূরের (জ্ঞান) আলোকে, আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদানের আশায়, তাঁর মর্জিমাফিক আমল করা। এবং আল্লাহর দেওয়া নূরের মাধ্যমে, আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে, তাঁর অবাধ্যতা পরিত্যাগ করা।'[৬]

তাকওয়ার সংজ্ঞায় এরচেয়ে উত্তম কথা আর নেই। আসলে প্রত্যেক কাজেরই একটা ভিত্তি থাকে এবং তা সম্পাদনের দ্বারা কোনো না কোনো লক্ষ্য থাকে। আমল দ্বারা আল্লাহর আনুগত্য বা নৈকট্য লাভের শর্ত হলো, এর ভিত্তি ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। বান্দা কাজটি করবে কেবলমাত্র ঈমানের দাবিতে। না অভ্যাসের কারণে হবে, না মনের চাহিদা বা যশখ্যাতি অর্জনের জন্য হবে। অবশ্যই তা হতে হবে নিরেট ঈমানের দাবিতে। আর আমলের একমাত্র লক্ষ্য থাকবে আল্লাহর প্রতিদান এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশা; যাকে 'ইহতিসাব' বলা হয়। এজন্য এই মৌলিক বিষয় দুটিকে অনেক জায়গায় একত্রে আনা হয়েছে। নবি ﷺ বলেছেন,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا

'যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে রমাদানের সাওম পালন করে।'...

---

[৬] আয যুহদু লিইবনিল মুবারক, পৃষ্ঠা নং : ৪৭৩; হিলইয়াতুল আউলিয়া : ৩/৬৪; আয যুহদু লিলবায়হাকী : ৯৬৩

'যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে লাইলাতুল কদরে রাত্রি জাগরণ করে।'[৭]

এ ধরনের আরও অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে।

ত্বলক ইবনু হাবীবের কথার দ্বারা প্রথমে ঈমানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে; যা সমস্ত আমলের উৎস এবং উদ্দীপক। এরপর হাদীসে বর্ণিত দ্বিতীয় নীতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ ইহতিসাব তথা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রতিদান লাভের আশা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বান্দা আমল করবে।

এই হচ্ছে তাকওয়ার পরিচয়। ঈমানের সকল মৌলিক ও শাখাগত বিষয়ের সমষ্টিই হলো তাকওয়া। নেক কাজও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

উল্লিখিত আয়াতে একসাথে বলা হয়েছে—**"তোমরা নেক কাজ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহযোগিতা করো।"** এক্ষেত্রে 'নেক কাজ' এবং 'তাকওয়া' উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখানো যেতে পারে। একটি হচ্ছে লক্ষ্য অর্জনের উপকরণ, আর অন্যটি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। সত্তাগতভাবেই নেক কাজ হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত বিষয়। কারণ এটা বান্দার পূর্ণতা এবং তার ন্যায়পরায়ণতার পরিচায়ক। যেমনটা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। অপরদিকে তাকওয়া হলো নেক কাজের পথপ্রদর্শক এবং মাধ্যম। তাকওয়া শব্দটি এদিকেই ইঙ্গিত করে। তাকওয়া শব্দটির মূল হচ্ছে وَقْوَى আর اَلْوِقَايَةُ শব্দের অর্থ প্রতিরক্ষা। সুতরাং 'তাকওয়া' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় প্রতিরক্ষা গ্রহণ করা। কারণ, মুত্তাকি ব্যক্তি তার ও জাহান্নামের আগুনের মাঝে প্রতিরক্ষা তৈরি করে। এর মাধ্যমেই সে কাঙ্ক্ষিত নেকির পথে অগ্রসর হয়। তাই, তাকওয়া ও নেকির সম্পর্ক হলো সুস্থতা ও পথ্যের মতো।

কুরআন কারীমের শব্দাবলি ও এর মর্ম বোঝা এবং নবি ﷺ-এর ওপর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার সীমারেখা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, এটা উপকারী জ্ঞান। এই জ্ঞান যার নেই, আল্লাহ তাআলা তার সমালোচনা করেছেন। এ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান না থাকার কারণে বড় ধরনের দুটি সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

প্রথমত, কোনো শব্দের মর্মার্থের মধ্যে এমন বিষয় ঢুকে পড়ে, যার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এরপর সেটাকেই প্রকৃত হাকিকত বলে চালিয়ে দেওয়া হয়।

---

[৭] এই হাদীসের অংশ দুটি সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১৯০১ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৭৬০ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে

ফলে আল্লাহ তাআলা যে-দুটি বিষয়ের মাঝে তফাত করেছেন, (এইসব গলদ ব্যাখ্যার দ্বারা) তা একাকার হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, শব্দের কিছু মর্মার্থ ছুটে যায় এবং সেগুলোর মধ্যে তার হুকুম আর বাকি থাকে না। ফলে আল্লাহ তাআলা যে-দুটি বিষয়কে একত্র করেছেন, তা আলাদা হয়ে পড়ে।

বিচক্ষণ ব্যক্তি এই উদাহরণ বুঝতে পারেন। ফলে তিনি দেখতে পান যে, সিংহভাগ মতপার্থক্যের উৎপত্তি এখান থেকেই হয়ে থাকে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে বিশাল বইও যথেষ্ট হবে না। উদাহরণস্বরূপ 'খামর' শব্দটির কথা বলা যায়। এটি সকল নেশা উদ্রেককারী বস্তুকে শামিল করে। কোনো একটি নেশাদার বস্তুকে এর থেকে আলাদা করে, খামরের হুকুম উঠিয়ে দেওয়া বৈধ হবে না। একইভাবে 'মাইসির' তথা জুয়া শব্দ। এখান থেকে জুয়ার কিছু প্রকারকে আলাদা করা যাবে না। 'নিকাহ' শব্দের ক্ষেত্রেও একই কথা। নিকাহ'র আওতায় পড়ে না, এমন কিছুকে এর অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক নয়। একইভাবে 'রিবা' শব্দটি। সুদের কিছু প্রকারকে এর থেকে বের করে দেওয়া এবং সুদ নয় এমন কিছুকে এই শব্দের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। 'যুলুম-ইনসাফ', 'মারূফ-মুনকার' ইত্যাদি অসংখ্য শব্দ রয়েছে, যেখানে শব্দের মর্মার্থ সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে, কুরআন কারীম বোঝার ক্ষেত্রে বড় ধরনের ভ্রান্তি হতে পারে।

মোটকথা মানুষ হিসেবে আমাদের সকলেরই সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই জন্যই আমরা সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করি। পরস্পর মেলামেশা, ওঠাবসা করি। পরস্পরের একত্রিত হওয়া ও মেলামেশার উদ্দেশ্যই হলো নেক কাজ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অন্যকে সহযোগিতা করা। এক্ষেত্রে প্রত্যেকেই তার সতীর্থকে সহায়তা করবে। হোক তা জ্ঞানগতভাবে কিংবা কাজের মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে জ্ঞান-গরিমা ও শক্তি-সামর্থ্যে অস্বয়ংসম্পূর্ণ করে সৃষ্টি করেছেন। এর পেছনে হিকমাতও রয়েছে। এর ফলে তারা একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখে। এটাই বাস্তবতা। আর এই সহযোগিতা যদি নেক কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে না হয়, তবে স্বাভাবিকভাবেই বিপরীতটা ঘটবে। যে ব্যাপারে আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হচ্ছে—**'তোমরা পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কোরো না।'**

'নেক কাজ ও তাকওয়া' যেমনিভাবে আবশ্যিকভাবে পালনীয়, তেমনিভাবে

'পাপাচার ও সীমালঙ্ঘন'-ও বর্জনীয়। পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পাপাচার সত্তাগতভাবেই হারাম। আর সীমালঙ্ঘন হলো—বৈধ বিষয় মাত্রা ছাড়িয়ে হারামের রূপ নেওয়া।

এজন্য যিনা, মদ, চুরি প্রভৃতি হলো পাপাচার। আর চারজন স্ত্রী বিদ্যমান থাকতে পঞ্চম কাউকে বিয়ে করা, পাওনাদারের কাছ থেকে পাওনার চেয়েও বেশি অর্থ আদায় করা প্রভৃতি হলো সীমালঙ্ঘন। এটা আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করার শামিল। এ ব্যাপারে ইরশাদ করা হয়েছে,

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

'এটা আল্লাহর সীমারেখা। কাজেই একে অতিক্রম কোরো না। আর যারা আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করে, তারা যালিম।'[৮]

আরেক জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলছেন,

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ

'এটা আল্লাহর সীমারেখা। এর নিকটবর্তী হয়ো না।'[৯]

এক আয়াতে তিনি সীমারেখা অতিক্রম করতে নিষেধ করেছেন। আরেক আয়াতে কাছে যেতেও মানা করেছেন। কেন? কারণ বস্তুর শেষসীমা কখনও বস্তুর অধীনস্থ থাকে, আবার কখনও থাকে না। বরং সীমানা থেকেই তার বিপরীত বিষয় শুরু হয়ে যায়। প্রথম দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ তাআলার সীমারেখা অতিক্রম না করতে বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নিকটবর্তী হতেও নিষেধ করা হয়েছে।

আমরা শুরুতেই বলেছি, সূরা আল মায়িদার ওই আয়াতটিতে দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১. নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক এবং এই সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব।
২. নিজেদের ও আল্লাহর মধ্যকার সম্পর্ক এবং এই বিষয়ক কর্তব্য। (আয়াতটি আমরা আবার উল্লেখ করছি) :

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

---

[৮] সূরা বাকারাহ, ২ : ২২৯
[৯] সূরা বাকারাহ, ২ : ১৮৭

'নেক কাজ ও তাকওয়ার কাজে তোমরা একে অপরকে সহযোগিতা করো; পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কোরো না। আর তাকওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি প্রদানে অত্যন্ত কঠোর।'[১০]

এতক্ষণ প্রথম পয়েন্ট নিয়ে কথা হলো। এবার বান্দা ও তার রবের মধ্যকার সম্পর্কের কথায় আসা যাক। এ ক্ষেত্রে বান্দার দায়িত্ব কী? এ ব্যাপারে তার করণীয় কী? বান্দা তার রবের আনুগত্যের পথে আগে বাড়বে এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকবে। আল্লাহ তাআলা এটাই দুই শব্দে বলে দিয়েছেন— وَاتَّقُوا اللّٰهَ (তাকওয়া অবলম্বন করো)।

আলোচ্য আয়াতে বান্দাদের পারস্পরিক কর্তব্য এবং রবের প্রতি তাদের কর্তব্য— এই দুটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো।

প্রথম কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে চাইলে, নিজের বড়ত্বের সিংহাসনকে ভেঙে ফেলতে হবে। নেক কাজ ও তাকওয়ার বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে নিজের সুনাম, খ্যাতি বা যশের চিন্তা একদম ঝেড়ে ফেলতে হবে মাথা থেকে। এই সহযোগিতা হবে নিছক আল্লাহর আদেশ পালনার্থে। একজন মুসলিম হিসেবে অপর ভাইয়ের প্রতি ইহসানের জায়গা থেকে। দ্বিতীয় কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে চাইলে, আল্লাহ ও বান্দার মাঝ থেকে মাখলুককে বের করে দিতে হবে। ঐশী ভালোবাসার চাদরে ঢাকা বান্দার এই একনিষ্ঠ দাসত্বের তাঁবুতে এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ থাকতে পারবে না।

এই কর্তব্য দুটি পালন করতে গিয়ে বান্দার ত্রুটিবিচ্যুতি হয় মূলত এ সূক্ষ্ম পয়েন্টে মনোযোগ না দেওয়ার কারণে। অতএব এই পয়েন্টটি গভীরভাবে আত্মস্থ করার কোনো বিকল্প নেই। শাইখ আবদুল কাদির ﷺ একই কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'স্রষ্টার সান্নিধ্যে পুরো সৃষ্টি থেকে পৃথক হয়ে যাও। আর সৃষ্টির সেবায় ভুলে যাও নিজের (বড়ত্ব)-কে। এটা যে পারবে না, সে বিপথে চলতে থাকবে। তার কার্যক্রম আর সঠিক জায়গায় স্থির থাকবে না।'[১১]

---

[১০] সূরা মায়িদাহ, ৫ : ২

[১১] আল কাওয়াকিবুস সারাহ : ৩/১১৫

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত

এক মুসাফির সফরের কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সফরের এই পথকেই সে তখন বাসস্থান বানিয়ে নিল। ফলে জন্মভূমির পরিচিত মুখ আর সুযোগ-সুবিধার মাঝে এক আড়াল সৃষ্টি হলো। মুসাফির পেয়ে বসল এক নির্জন পরিবেশ। ঠিক সেই সময়টাতে তার ভেতর চিন্তার এক নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি হলো। সে তার মনোযোগ এক মহান বিষয়ের প্রতি নিবিষ্ট করল। এর মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি গন্তব্যের প্রতিটি মানযিল খুব সহজেই অতিক্রম করা এবং বাকি জীবনটা এ পথেই কাটিয়ে দেওয়া তার জন্য সহজ হবে। এরপর সুপথ প্রদর্শনের একমাত্র মালিক আল্লাহ তাআলা তাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পথ দেখালেন। সেটি হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত। এই হিজরত সর্বাবস্থায় সকলের ওপর ফরযে আইন। এই ফরযিয়্যাতের আবশ্যকতা কখনও কারও ওপর থেকে রহিত হয় না। বান্দার কাছে আল্লাহর চূড়ান্ত কাম্য বিষয় এই হিজরত।

হিজরতের প্রকারভেদ

হিজরত দুই ধরনের।

১. সশরীরে এক দেশ থেকে আরেক দেশে হিজরত। শারীয়াতে এই হিজরতের নির্ধারিত বিধিবিধান রয়েছে। আমাদের আলোচনা এই প্রকারের হিজরত নিয়ে নয়।

২. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত করা। সশরীরে নয়, শর্তহীন দাসত্ব, আত্মসমর্পণ ও ইখলাসের মাধ্যমে। অনুসরণ, অনুকরণ ও একমাত্র আদর্শ হিসেবে সুন্নাহকে গ্রহণ করে রাসূলের দিকে হিজরত। আমাদের আলোচনার বিষয় এটিই। এটাই আসল ও প্রকৃত হিজরত। শারীরিক হিজরত মূলত এই হিজরতেরই অনুগামী।

আল্লাহর দিকে হিজরত

হিজরত মানে এক জায়গা ছেড়ে আরেক জায়গার দিকে চলে যাওয়া। প্রত্যেক হিজরতের একটা শুরু ও শেষ থাকে। অর্থাৎ বান্দা অন্তরের মাধ্যমে গাইরুল্লাহ্র ভালোবাসা থেকে আল্লাহ্ তাআলার ভালোবাসার দিকে হিজরত করবে। গাইরুল্লাহ্র দাসত্ব থেকে হিজরত করবে আল্লাহ্র দাসত্বের দিকে। গাইরুল্লাহ্কে ভয় না করে আল্লাহ্কে ভয় করবে। গাইরুল্লাহ্র কাছে প্রত্যাশা করা বাদ দিয়ে প্রত্যাশা করবে আল্লাহ্ তাআলার কাছে। গাইরুল্লাহ্র ওপর ভরসা ছেড়ে দিয়ে, আল্লাহ্র ওপর তাওয়াক্কুল করবে। গাইরুল্লাহ্কে বাদ দিয়ে এক আল্লাহ্কে ডাকবে, গাইরুল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাওয়ার পরিবর্তে আল্লাহ্র কাছে চাইবে এবং গাইরুল্লাহ্র আনুগত্য থেকে বের হয়ে আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যের দিকে হিজরত করবে। এটাকেই বলে আল্লাহ্র পানে ধাবিত হওয়া। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

فَفِرُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۖ

'অতএব, তোমরা আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হও।'[১২]

তাওহীদের দাবিও এটিই। বান্দা আল্লাহ্র কাছ থেকে পলায়ন করে তাঁর দিকেই ছুটে আসবে।

এই পলায়ন করা ও ছুটে আসার মধ্যে তাওহীদের এক গূঢ় রহস্য রয়েছে।

বান্দা তার আনুগত্য-আত্মসমর্পণ, ভয়-প্রত্যাশা, কামনা-যাচনা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার জন্যই সংরক্ষিত রাখবে। শাস্ত্রীয় ভাষায় একে তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ বলা হয়। অর্থাৎ ইবাদাত ও ইবাদাতের আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। সব নবির দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু এটিই ছিল। এটাই হলো আল্লাহ্ তাআলার 'দিকে' ছুটে আসার রহস্য। তাহলে আল্লাহ্ তাআলা থেকে পলায়নের ব্যাপারটা কী হবে?

এখানেও আল্লাহ্ তাআলার তাওহীদের এক গূঢ় রহস্য লুকিয়ে আছে। একটু ভেঙে বলছি। দেখুন, দুনিয়ার যত দুঃখ-বিপর্যয় থেকে বান্দা দূরে থাকতে চায়, অপছন্দ করে, পলায়ন করতে চায়, তা একমাত্র আল্লাহ্র ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে। ইতিপূর্বে আমরা যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম, যেগুলো থেকে ফিরে এসে বান্দাকে আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হতে হবে, সেগুলোও আল্লাহ্রই ক্ষমতাধীন। কারণ, আল্লাহ্

---

[১২] সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৫০

তাআলা যা কিছু অস্তিত্বে আনার ইচ্ছা করেন, তা-ই অস্তিত্বে আসে। তিনি যা চান না, তা কখনোই অস্তিত্বে আসতে পারে না। বান্দা যা কিছু থেকে পলায়ন করে, যেসব বিষয় থেকে বান্দাকে আবশ্যিকভাবে বিরত থাকতে হয়, তার কোনোকিছুই আল্লাহ তাআলার ক্ষমতার বাইরে নয়। অতএব বান্দা যখন কোনোকিছু থেকে পালিয়ে অন্য দিকে ছুটে চলে, বাস্তবে সে আল্লাহর থেকে আবার আল্লাহর দিকেই ছুটে আসে। এ বিষয়টি যে ধরতে পারবে, সে নবি ﷺ-এর নিম্নোক্ত দুআ অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।

أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ

'আমি আপনার থেকে আপনার কাছেই আশ্রয় চাই।'[১৩]

لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ

'আপনার থেকে পালিয়ে আপনার দিকে যাওয়া ছাড়া আমাদের অন্য কোনো আশ্রয়স্থল ও পরিত্রাণের পথ নেই।'[১৪]

বিশ্বজগতে যার ভয়ে পলায়ন করা হয়, যার থেকে পরিত্রাণ চাওয়া হয়, তার সবই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। আল্লাহই তো তাকে সৃষ্টি করেছেন। তাহলে কী দাঁড়াল?

আশ্রয়প্রার্থী বান্দা আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট বিষয় থেকে পলায়ন করে, আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী হলো। বান্দা যেন আল্লাহর থেকে পালিয়ে আবার তাঁর দিকেই ছুটে গেল। আল্লাহ তাআলার কাছে স্বয়ং তাঁর থেকেই আশ্রয় প্রার্থনা করল।

এই চিন্তা যদি বান্দা নিজের অন্তরে গেঁথে নিতে পারে, তবে তার অন্তর আল্লাহ ছাড়া অন্য যে-কারও থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অন্য কিছুর ভয়, আশা কিংবা ভালোবাসা থেকে মুক্ত হয়ে নিরেট তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। তাকদীরের বিশ্বাসেও আর কোনো সমস্যা থাকবে না। কারণ সে বুঝতে পারবে—আমি যার থেকে পলায়ন করছি, যা কিছু থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, তা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও ক্ষমতার অধীন। এসব তাঁরই সৃষ্টি। তখন বান্দার হৃদয়ে সেই সৃষ্টিকর্তার ভয় ছাড়া আর কিছু বাকি থাকে না।

---

[১৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৪৮৬

[১৪] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ২৪৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৭১০

বান্দার পলায়ন করাটা যদি এমন কোনো বিষয় থেকে হতো যা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছে এবং ক্ষমতার বাইরে, তখন ওই বিষয়ের প্রতি ভীত হওয়াটা তার জন্য স্বাভাবিক ছিল। যেমন কোনো ব্যক্তি শক্তিশালী প্রাণী থেকে শক্তিশালী বস্তুর দিকে পলায়ন করছে। পালানোর সময় তার মধ্যে একটা ভয় কাজ করবে। সে আশঙ্কায় থাকবে—যার দিকে সে ছুটছে, সে যদি এই প্রাণী থেকে তাকে বাঁচাতে সক্ষম না হয়! পক্ষান্তরে যদি এমনটা হয় যে, সে যার দিকে ছুটে যাচ্ছে সে-ই ওই প্রাণীর নিয়ন্ত্রক, তখন তার হৃদয়ের সব মনোযোগ ওই একক সত্তার দিকেই নিবিষ্ট থাকবে। কোনো রকম দুশ্চিন্তা কাজ করবে না। এই গূঢ় রহস্যই রয়েছে নবি ﷺ-এর কথা দুটিতে—**'আমি আপনার থেকে আপনার কাছেই আশ্রয় গ্রহণ করি।'**[১৫] **'আপনার থেকে পালিয়ে আপনার দিকে যাওয়া ছাড়া আমাদের অন্য কোনো আশ্রয়স্থল ও পরিত্রাণের পথ নেই।'**[১৬]

আমরা অনেকেই এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলে থাকি। কিন্তু এই পয়েন্টটি খুব কম মানুষই ধরতে পারে। অথচ এটাই মূল বিষয়।

একটা বিষয় লক্ষ করুন, বান্দার সব বিষয় ঘুরে ফিরে ওই এক জায়গাতেই চলে আসে—'আল্লাহর থেকে পলায়ন করে তাঁর কাছেই ছুটে আসা।' অর্থাৎ কিছু বিষয় থেকে ফিরে এসে কিছু বিষয়ের দিকে ছুটে যাওয়া। আমরা শুরুতে-যে আল্লাহর দিকে হিজরত করার কথা বলছিলাম, তার মর্মার্থও এটাই। এজন্যই নবি ﷺ বলেছেন,

الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

'(প্রকৃত) মুহাজির ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়কে পরিত্যাগ করে।'[১৭]

ঈমান ও হিজরতের মধ্যে সম্পর্ক থাকার কারণে, একটি অপরটির পরিপূরক। সে জন্যেই আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমের একাধিক স্থানে উভয়টির আলোচনা পাশাপাশি এনেছেন। মোটকথা, আল্লাহ তাআলার দিকে হিজরতের মর্ম হচ্ছে, আল্লাহর অপছন্দের কাজগুলো ছেড়ে দিয়ে তাঁর সন্তুষ্টির কাজ সম্পাদন করা।

এখানে মৌলিক বিষয় দুটি। পছন্দ এবং অপছন্দ, তথা ভালোবাসা এবং ঘৃণা। কারণ

---

[১৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৪৮৬

[১৬] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ২৪৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৭১০

[১৭] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১০ ও ৬৪৮৪

যে ব্যক্তি কোনো কিছু ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছুর দিকে হিজরত করবে, অবশ্যই তার পরিত্যাগকৃত বিষয়ের চেয়ে সামনে থাকা বিষয়টি বেশি পছন্দের হবে। ফলে সে দুটি বিষয়ের মধ্যে প্রিয়টিকে প্রাধান্য দেবে। তবে বান্দার প্রবৃত্তি ও শয়তান তার রবের পছন্দ ও সন্তুষ্টির বিপরীতে আহ্বান করে। তাই সে এগুলোর মাধ্যমে পরীক্ষায় পড়ে যায়। অবস্থা এমন হয় যে, একদিকে তারা ডাকে আল্লাহ তাআলার নাফরমানির দিকে, আর অন্তরে থাকা ঈমানের দাবি তাকে টানতে থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে। ফলে মৃত্যু পর্যন্ত তাকে হিজরত চালিয়ে যেতে হয়।

▪ এই হিজরতের শক্তি এবং দুর্বলতা

এই হিজরত শক্তিশালী এবং দুর্বল হয়ে থাকে আহ্বায়কের ভালোবাসার শক্তি এবং দুর্বলতার ভিত্তিতে। বান্দার অন্তরে ভালোবাসার আহ্বায়ক শক্তিশালী হলে, এই হিজরত শক্তিশালী হয়ে থাকে। আর যদি আহ্বায়ক দুর্বল হয়, তবে হিজরতও দুর্বল হয়ে পড়ে। এমনকি অবস্থা এমন হয় যে, না-পাওয়া যায় কোনো জ্ঞানের নিদর্শন, আর না পাওয়া যায় কোনো রকম ইচ্ছাশক্তি।

অবাক-করা বিষয় হলো, মানুষ কুফরের এলাকা থেকে ইসলামি দেশে হিজরত করা নিয়ে নানান আলোচনা এবং মাসআলা উদ্‌ঘাটন করে থাকে। মক্কাবিজয়ের মাধ্যমে কোন হিজরতের সমাপ্তি ঘটেছে, তা নিয়ে অনেক পর্যালোচনা করে। কিন্তু যে হিজরত জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত করে যেতে হয়, সে বিষয়ে না থাকে জ্ঞান, আর না থাকে ইচ্ছা। এর কারণ হলো সৃষ্টির উদ্দেশ্য ভুলে যাওয়া এবং গাইরুল্লাহকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়া। এটা সেসব লোকের অবস্থা, যার অন্তর্চক্ষুতে ছানি পড়ে গেছে। আর ধ্বংসস্তূপের নিচে প্রকৃত ইলম চাপা পড়েছে। আল্লাহ তাআলাই প্রকৃত সাহায্যকারী। তিনিই তাওফীক দেন। তিনি ছাড়া না আছে কোনো ইলাহ, আর না আছে অন্য কোনো প্রতিপালক।

রাসূল ﷺ-এর দিকে হিজরত

দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, এটা এখন একটি প্রতিকী বিষয় হয়ে গেছে; যার নামটাই শুধু বাকি আছে, বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নেই। যেন প্রচণ্ড ধুলিঝড় এসে, এর কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট রাখেনি। যেন শত্রুর আক্রমণে আশেপাশের ঝরনাধারা শুকিয়ে গেছে। ফলে মুমিনের অবিকল্প এই পথ আজ খোদ মুসলিম-সমাজেই অপরিচিত। এ পথের পথিক আজ অল্প কিছু মানুষ, যাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। উম্মাত দাবিকারী হাজার হাজার মানুষ থেকে হয়ত দু-একজন পাওয়া যাবে। এই হিজরতের পথে যে নেমেছে, সে যেন আজ কাছে থেকেও দূরে। বহু জনতার

মাঝেও একা। নিজ দেশেও প্রবাসী। লোকেরা বিভিন্ন মতাদর্শের পেছনে ছোটে আর সে তা থেকে পালিয়ে বেড়ায়। আর সে যা তালাশ করে, অন্যদের কাছে তা গুরুত্বহীন। তার অবস্থা সবার চেয়ে আলাদা। যাত্রাপথে সে সঙ্গীহীন, একা। তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। অন্যদের চোখ যখন সুখনিদ্রায় বিভোর, সুপথের তালাশে তখন সে বিনিদ্র রজনী কাটায়। সবাই যেন নববি হিজরতের পথ থেকে হাত গুটিয়ে বসে আছে, আর সে কোমর বেঁধে তার অন্বেষণ করছে। নিজেদের মতের বিরুদ্ধে যাওয়ায় লোকেরা তাকে নানাভাবে দোষারোপ করে চলছে। তাদের অজ্ঞতা এবং প্রবৃত্তির বিরোধিতা করার কারণে, সবাই তাকে ঘৃণার চোখে দেখে। তাকে চোখে চোখে রাখে। সে যেন বিপদে পড়ে, তার প্রতীক্ষায় থাকে। এই অবস্থায় আসলে কিছু বলার নেই। শুধু কুরআনের ভাষায় বলতে হয় :

فَتَرَبَّصُوٓاْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ۝٥٢

'কাজেই, তোমরা অপেক্ষা করো, আর আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ।'[১৮]

قَٰلَ رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۝١١٢

'রাসূল বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আপনি ন্যায়ানুগ ফায়সালা করে দিন। আমাদের পালনকর্তা তো দয়াময়; তোমরা যা বলছ, সে বিষয়ে আমরা তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।'[১৯]

মোটকথা, এই নববি হিজরতের পথ বড়ই বন্ধুর। কন্টকাকীর্ণ ও দুর্গম। অনাগ্রহী ব্যক্তির জন্য এটা অকল্পনীয়। অকর্মণ্যের জন্য অসাধ্য। পক্ষান্তরে আগ্রহীদের জন্য এটা পানির মতো সহজ।

আল্লাহর শপথ! এটা তো সমুজ্জ্বল আলো, কিন্তু তুমি অন্ধকারে নিমজ্জিত। এটা পূর্ব-পশ্চিম আলোকিতকারী পূর্ণিমার চাঁদ, কিন্তু তুমি হলে নিকষকালো মেঘ। এটা সুমিষ্ট ও স্বচ্ছ পানির ধারা, কিন্তু তুমি হলে এক পশলা কাদা। এখান থেকেই এক মহান কল্যাণের শুরু, কিন্তু তোমার কোনো খবর নেই।

▪ শর্তহীন আনুগত্য

কাজেই, এই হিজরতের কথা শোনো। তার পথ অনুসরণ করো। নিজে নিজে একটু হিসাব কষে দেখো। তুমি কি এই পথের হিজরতকারী হবে, নাকি পরিত্যাগকারী?

---

[১৮] সূরা তাওবা, ৯ : ৫২
[১৯] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ১১২

তো এই হিজরতের সংজ্ঞা কী? প্রিয়নবি ﷺ-এর নিঃশর্ত অনুসরণ। জীবনের আদর্শ হিসেবে একমাত্র তাঁকেই গ্রহণ করা। সকল পথ, মত ও তন্ত্রমন্ত্রের ওপর তাঁর সুন্নাহকে অগ্রাধিকার দেওয়া। সুন্নাহর দীপ্ত আলোতেই হিদায়াত ও মুক্তির পথ খোঁজা। সবকিছু ছেড়ে দিয়ে জীবনতরীর মুখ মদীনাওয়ালার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া। জীবনে উদ্ভাবিত সকল বিষয়ে 'আস-সাদিকুল মাসদূক' নবি আলাইহিস সালামের মুখনিঃসৃত নূরানি ঝরনার দিকে ছোটা। সবকিছু উপেক্ষা করে তাঁর হিদায়াতের খনিতেই সমাধানের পথ খোঁজা। যার ব্যাপারে প্রতিপালক এই স্বীকৃতি দিয়েছেন :

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝٤

'তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। তা তো ওহি, যা তার কাছে প্রত্যাদেশ হয়।'[২০]

অতএব প্রত্যেক বিষয়েই তার সত্যায়ন পেতে হবে। রিসালাতের কষ্টিপাথরে না টিকলে, কোনোকিছুই গ্রহণযোগ্য নয়। কোনো সাক্ষীকে তিনি যদি সত্যায়ন না করেন, তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। সে যে-ই হোক না কেন। এটাই রাসূলের দিকে হিজরত।

আমরা বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াই—'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের দেখানো পথে চলি। তাদের রজ্জু আঁকড়ে ধরি। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি। তাঁরা কি কম বুঝতেন? আমার কল্যাণের ব্যাপারে তাদের বিবেচনা অবশ্যই ভালো ছিল।'

(নবিজির অনুসরণ না করে এই ধরনের কথা বললে,) আমার সেই হিজরতের আর কী বাকি থাকল? সব কিছুই তো বাপদাদাদের ওপর ছেড়ে দিলাম। সফলতা আর মুক্তির দায়িত্ব তো তাদের কাঁধেই ন্যস্ত করলাম। নিজেরা অলস হয়ে গেলাম এই ভেবে যে, আমাদের বুঝ-বুদ্ধির চেয়ে তাদেরটা অনেক ভালো ছিল। আসলে আমরা এই নশ্বর দুনিয়ার মোহে পড়ে আছি। সেই সাথে অলসতা ও অকর্মণ্যতা আমাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। নবি ﷺ-এর সুন্নাহকে অনুধাবন আর গ্রহণ করার প্রতি আমাদের কোনো আগ্রহ নেই। সত্যকে এড়িয়ে যেতেই আমরা এসব কথা বলি। মাআযাল্লাহ! অথচ এই হিজরত সবার ওপর সর্বাবস্থায় ফরয। 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'-এর দাবিও এই হিজরত। কেননা এই শাহাদাতের দাবি হচ্ছে, আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করা, রাসূলের সবকথা একবাক্যে বিশ্বাস করে নেওয়া এবং তাঁর দেখানো পথে আল্লাহর ইবাদাত

[২০] সূরা নাজম, ৫৩ : ৩-৪

করা। এটা 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এরও দাবি।

এই দুই হিজরতের ব্যাপারে কবরে ও কিয়ামাতে প্রত্যেক বান্দা জিজ্ঞাসিত হবে। দুনিয়াতেও তার থেকে এই দুই হিজরতই কাম্য। তাহলে কী দাঁড়ালো? তিন স্থানে বান্দা এই দুই বিষয়ে আদিষ্ট : দুনিয়ার জীবন, কবরের জগৎ এবং শেষ বিচারের দিন। ক্বাতাদাহ ﵀ বলেন, দুটি বাক্যের ব্যাপারে সব মানুষ জিজ্ঞাসিত হবে :

১. তোমরা কীসের ইবাদাত করতে?

২. তোমাদের কাছে প্রেরিত রাসূলের ডাকে কীভাবে সাড়া দিয়েছিলে?[২১]

সবমিলিয়ে এই দুটি বাক্যই কালিমা শাহাদাতের দুই অংশ। এই হিজরত দুটিই শাহাদাতের দাবি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

'অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট সব বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফায়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।'[২২]

আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের মহান সত্তার শপথ করে বলেছেন, বিবদমান সব বিষয়ে এবং দ্বীনের সর্বক্ষেত্রে নবি ﷺ-কে চূড়ান্ত ফয়সালাকারী হিসেবে না মানলে, ঈমানদার হওয়া যাবে না। আয়াতে 'সব বিবাদের' বলে ব্যাপকতার সাথে হুকুম দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, কেউ যদি একটি বিষয়েও নবিজিকে ফায়সালাকারী না মানে, নবিজির বিধান ছাড়া অন্য কোনো মতবাদকে ফায়সালাকারী হিসেবে সাব্যস্ত করে, তবে তার ঈমান প্রত্যাখ্যাত হবে। এটুকুই শেষকথা নয়। সাথে সাথে হৃদয়ের প্রশস্ততার ব্যাপারেও শর্তারোপ করা হয়েছে—রাসূলের ফায়সালার প্রতি অন্তরে কোনো রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব রাখা যাবে না। কোনো রকম কিন্তু রাখা যাবে না; বরং খুশিমনে তা গ্রহণ করবে। এমন নয় যে, বাধ্য হয়ে ঘোলা জল পান করবে বা চাপে পড়ে মেনে নেবে। এই অবস্থা ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক। ঈমানের দাবি হচ্ছে সন্তুষ্টির সাথে (নবিজির ফায়সালা) মেনে নেওয়া। এ ক্ষেত্রে নিজের অবস্থান যাচাই করতে চাইলে, বান্দার উচিত নিজের অন্তরের দিকে লক্ষ করা। এই ব্যাপারে

---

[২১] তাফসীরুত তাবারি : ১৪/৪৬; তাফসীরু ইবনি কাসীর : ২/৫৭৯

[২২] সূরা নিসা, ৪ : ৬৫

চিন্তা-ফিকির করা যে : আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা যেসব বিষয়ে আমি আমার প্রবৃত্তি কিংবা দেশীয়, গোত্রীয় ও পূর্বপুরুষদের রুসুম-রেওয়াজের অনুসরণ করি, তার বিরুদ্ধে রাসূলের বিধান আসলে আমার অন্তরের অবস্থা কেমন হয়?

بَلِ ٱلْإِنسَـٰنُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ بَصِيرَةٌ ۝١٤ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُۥ ۝١٥

'বরং মানুষ নিজের সম্পর্কে সম্যক অবগত; যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে।'[২৩]

আল্লাহ তাআলার এমন কিছু বান্দা আছেন, যাদের কাছে নবিজির কোনো সুন্নাহ প্রমাণিত হলে তারা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেন। এর জন্য যদি নিজের যশ-খ্যাতি বিসর্জন দিতে হয় তবুও 'কুছ্ পরওয়া নেহি!' তাদের কথা একটাই, 'আমার নবি যদি বলে থাকেন...!'

▪ পূর্ণ সম্মতির ভিত্তিতে আনুগত্য

আবার কিছু লোকের অন্তরে কুরআন-সুন্নাহর টেক্সটের প্রতি অনেক বিদ্বেষ (লুকিয়ে থাকে)! প্রবৃত্তির অনুসরণ করার জন্য ওরা ইনিয়ে বিনিয়ে কত কথাই-না বলে। তাদের মনের বাসনা এমন—এই বিধানগুলো না এলেই তো ভালো হতো!

আল্লাহ তাআলা এতটুকুতেই শেষ করেননি। এর সাথে আরও যুক্ত করেছেন, **'এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।'** অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল স. যা ফায়সালা দেবেন, তা স্বেচ্ছায় মেনে নেবে। সন্তুষ্টচিত্তে সেই ফায়সালার সামনে আত্মসমর্পণ করবে। বল প্রয়োগকারী স্বৈরাচারের কাছে পরাভূত ব্যক্তির মতো বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ নয়; বরং একজন অনুগত গোলামের মতো নিজেকে সঁপে দেওয়া, যার কাছে মনিব সবার চেয়ে প্রিয়। সে এটা অনুধাবন করতে পারে যে, নিজেকে মনিবের কাছে সমর্পণ করার মধ্যেই তার যত সুখ ও সফলতা। সে ভালো করে জানে, মনিবই তার সর্বাধিক আপন, তার প্রতি সবচেয়ে সদয়। তিনিই সবচেয়ে বেশি কল্যাণকামী এবং তাকে রক্ষা করতে সবচেয়ে বেশি তৎপর। এ সব কিছুতে তিনিই সর্বাগ্রে। এমনকি তার নিজের চেয়েও বেশি। বান্দা যখন আল্লাহর রাসূলের ব্যাপারে এই উপলব্ধি হৃদয়ে গেঁথে নিতে সক্ষম হবে, তখন বিনাবাক্যে নিজেকে সোপর্দ করবে তাঁর কাছে। অন্তরের প্রতিটি অংশ তাঁর কাছে সঁপে দেবে। আর এটা বিশ্বাস করবে যে, রাসূলের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা ও তাঁর আনুগত্য করার মাঝেই নিজের সৌভাগ্য ও সফলতা।

[২৩] আল কিয়ামাহ, ৭৫ : ১৪-১৫

এই বিষয়টি আসলে ভাষায় প্রকাশ করার সম্ভব নয়। হৃদয়ের গভীর থেকে উপলব্ধি করার বিষয়। এটা শুধুই বোঝার বিষয়, বোঝানোর নয়। কেবল আশা কিংবা দাবির মাধ্যমেও অর্জন করার কোনো বিষয়ও এটি নয়। ভালোবাসার মানুষের নাম জানা এবং ভালোবাসার (ব্যাপারে নিজের) অবস্থান—এ দুয়ের মাঝে তফাত আছে। কোনো অবস্থার নাম জানা এবং অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া, দুটিকে অনেকেই এক করে ফেলে। সুস্থতা সম্পর্কে জানা অসুস্থ ব্যক্তি এবং সুস্থতার বর্ণনা দিতে অক্ষম সুস্থ ব্যক্তির মাঝেও পার্থক্য আছে। আবার ভয় সম্পর্কে জানে এমন ব্যক্তি এবং ভীত ব্যক্তিও একরকম নয়।

▪ বিভিন্ন আঙ্গিকে জোর প্রদান

আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলা নবি ﷺ-এর আনুগত্য করতে বিভিন্ন আঙ্গিকে জোর দিয়েছেন। একটু লক্ষ করুন :

১. শপথের শুরুতে 'না' যুক্ত করা : কেউ কেউ এই 'না'-কে অতিরিক্ত ধারণা করলেও প্রকৃতপক্ষে আরবদের কথায় এটার ব্যাপক প্রচলন আছে। তারা কোনো বিষয়ে জোর বুঝানোর জন্য কথার শুরুতে 'না' এবং শপথের শব্দ ব্যবহার করে থাকে। কুরআনুল কারীমের অনেক জায়গাতে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন কুরআনের সত্যতার ব্যাপারে কাফিররা মিথ্যা অভিযোগ করেছিল। তারা একে কবিতা, যাদু এমনকি গণকের কথা সাব্যস্ত করেছিল। তাদের কথা রদ করে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾

'অতএব না! (তাদের কথা সঠিক নয়,) আমি তারকারাজির অস্তাচলের শপথ করছি। নিশ্চয়ই এটা এক মহাশপথ, যদি তোমরা জানতে! অবশ্যই এটা সম্মানিত কুরআন।'[২৪]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلْخُنَّسِ ﴿١٥﴾ ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنَّسِ ﴿١٦﴾ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾ وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾

---

[২৪] ওয়াক্বিআহ, ৫৬ : ৭৫- ৭৭

‘অতএব না! (তাদের কথা সঠিক নয়,) আমি শপথ করছি সেসব নক্ষত্রের যা পশ্চাতে সরে যায়, যা প্রত্যাগমন করে ও অদৃশ্য হয়! শপথ করছি রাতের, যখন তার অবসান হয়! এবং প্রভাতের, যখন তার আগমন ঘটে! নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবাহকের আনীত বাণী।’[২৫]

অন্য জায়গায় বলেন,

لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ ① وَلَآ أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ② أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُۥ ③ بَلَىٰ قَـٰدِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُّسَوِّىَ بَنَانَهُۥ ④

‘না! (পুনরুত্থানের বিষয়ে তাদের মত সঠিক নয়,) আমি শপথ করছি কিয়ামাত-দিবসের! আরও শপথ করছি সেই মনের, যে নিজেকে ধিক্কার দেয়! মানুষ কি মনে করে আমি তাদের অস্থিসমূহ একত্র করব না? ওপরন্তু আমি তার আঙুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত সঠিকভাবে পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম।’[২৬]

মোটকথা, এভাবে না-বোধক শব্দ দ্বারা শপথ শুরু করার উদ্দেশ্যে হচ্ছে—শপথকৃত বিষয়টি আরও জোরদার করা এবং তার বিপরীত বিষয়টিকে চূড়ান্তভাবে রদ করা।

২. শপথের মাধ্যমে জোর প্রদান : সরাসরি শপথের মাধ্যমেও জোর দেওয়া হয়েছে।

৩. শপথকৃত বিষয়ের গুরুত্ব বুঝানো : কোনো সৃষ্টির নামে শপথ না করে, স্বয়ং নিজ সত্তার শপথ করা। আল্লাহ্ তাআলা কখনও নিজ সত্তার শপথ করেন, আবার কখনও তাঁর কোনো সৃষ্টির শপথ করেন। (কিন্তু এই ক্ষেত্রে নিজের নামে কসম করেছেন)।

৪. হৃদয়ের সংকীর্ণতাকে নাকচ : এর মাধ্যমে আত্মসমর্পণের শর্তারোপ করে, জরুরি তাগিদ করা হয়েছে।

৫. ক্রিয়ার সাথেও জোর প্রদান : আরবি ব্যাকরণের পরিভাষায় একে ‘আত-তাকীদ বিল মাসদার’ বলা হয়। আর এভাবে তাকীদযুক্ত করে উল্লেখ করার দ্বারা, বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে আসে।

---

[২৫] সূরা তাকভীর, ৮১ : ১৫-১৯
[২৬] সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ১-৪

রাসূল ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

ٱلنَّبِىُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ

'মুমিনদের কাছে নবি—তাদের নিজেদের থেকে বেশি ঘনিষ্ঠ।'[২৭]

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, রাসূল ﷺ যার কাছে আপন সত্তার চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ নয়, তাকে মুমিন গণ্য করার সুযোগ নেই। এখান থেকে বেশ কয়েকটি বিষয় অনুধাবন করা যায় :

ক) রাসূল ﷺ মুমিনের কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং ভালোবাসার পাত্র হবেন। কারণ কাউকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রধান ভিত্তি হচ্ছে ভালোবাসা। বান্দার কাছে তার নিজের সত্তা অন্য সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয়। তা সত্ত্বেও বান্দার জন্য আবশ্যক হচ্ছে—নবি ﷺ তার কাছে নিজ সত্তার চেয়েও বেশি ঘনিষ্ঠ হবেন, বেশি প্রিয় ও ভালোবাসার পাত্র হবেন। আর এর মাধ্যমেই তার ঈমানদার নামের সার্থকতা লাভ হবে। এই অগ্রাধিকার ও ভালোবাসার কারণে আনুগত্য, সমর্পণ এবং ভালোবাসার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের পূর্ণতা পাবে। যেমন : তাঁর ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর আদেশ নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া, অন্য সবকিছুর ওপর তাঁকে অগ্রাধিকার প্রদান করা ইত্যাদি।

খ) এ আয়াত থেকে আরও বুঝে আসে, বান্দা নিজের প্রতি নিজেই কোনো ফায়সালা দেওয়ার অধিকার রাখে না। রাসূলের ফায়সালাই তার জন্য চূড়ান্ত। নবি স. তার ওপর যে-কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করার পূর্ণ কর্তৃত্ব রাখেন। গোলামের ওপর মনিবের এবং সন্তানের ওপর পিতার যে কর্তৃত্ব, তার থেকে অনেক ঊর্ধ্বে হলো মুমিনের ওপর নবিজির কর্তৃত্ব। তবে সে লোকের ব্যাপার বড়ই আশ্চর্যজনক, যে নবি ﷺ-কে ফায়সালাকারীর পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে অন্য কাউকে

---

[২৭] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৬

বসিয়েছে। রাসূলের চেয়েও বেশি আস্থা রাখছে সে লোকের নির্দেশনাতে। নববি প্রদীপের আলো বাদ দিয়ে সে হিদায়াত খুঁজছে আকলের নির্দেশনাতে। রাসূলের কথাকে উপেক্ষা করার জন্য ইনিয়ে-বিনিয়ে নানান ছুতো সে দিচ্ছে : 'হাদীসের দ্বারা অকাট্য প্রমাণ সাব্যস্ত হয় না', 'এ যুগে হাদীসের প্রয়োগ সম্ভব না' ইত্যাদি। এসব কথা এটাই ইঙ্গিত করে যে, তার উদ্দেশ্য হলো যে-কোনোভাবে রাসূলের সুন্নাহ থেকে, এমনকি স্বয়ং রাসূল ﷺ থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। যা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি।

আল্লাহ তাআলার রাসূলকে সবার ওপরে স্থান দেওয়া, তাঁর সুন্নাহকে সবকিছুর ওপর অগ্রাধিকার দেওয়ার অর্থ হলো, প্রিয়-রাসূল ছাড়া সবকিছু পরিত্যাগ করা। সব কাজের সকল প্রকার কর্তৃত্ব তাঁকে অর্পণ করা। এরপর বাকি যার যত কথা আছে সব কিছু তাঁর মুবারক খিদমাতে অর্থাৎ নবিজির হাদীস ও সুন্নাহর কাছে পেশ করা। সেখান থেকে শুদ্ধতার স্বীকৃতি পেলে সেটা গ্রহণ করে নেওয়া। আর নববি কষ্টিপাথরের বিচারে না টিকলে সাথে সাথে ছুড়ে ফেলে দেওয়া। আর যদি শুদ্ধতার স্বীকৃতি এবং অস্বীকৃতির মাঝামাঝি থাকে, তাহলে সেটাকে কিতাবিদের হাদীসের রেখে দিয়ে দেখতে হবে কোন দিকের পাল্লা বেশি ভারী হয়ে যায়।

তো যে ব্যক্তি এই পথে চলবে, হিজরতের পথে সে অবিচল থাকতে পারবে। ইলম ও আমল তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। সবদিক থেকে সে হকের পথের সন্ধান পাবে।

মুখে দাবি করা 'ভালোবাসি'

আশ্চর্যের বিষয় হলো, এমন ব্যক্তিরাও রাসূলকে এই অগ্রাধিকার প্রদান ও ভালোবাসার দাবি করে, যাদের রাতদিনের চেষ্টা-সাধনা অন্যের কথা ও মতামত-কেন্দ্রিক। রাসূলের বাণী নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। সেগুলোকে প্রতিষ্ঠা করার কাজে তারা নিয়োজিত। তাদের রাগ-ভালোবাসা, সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টিও হয় সেগুলোকে কেন্দ্র করে। তাদের নালিশ দেওয়ার জায়গাও রাসূলের সুন্নাহ নয়, অন্য কোনো ব্যক্তি এবং ভিন্ন কোনো মতাদর্শ। নবিজির বক্তব্যকে তারা সেসব কথা ও মতামতের সাথে তুলনা করে। মিলে গেলে গ্রহণ করে নেয়। আর বিপক্ষে চলে গেলে অজুহাত খুঁজে বেড়ায়। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে, নানাভাবে পাশ কাটিয়ে চলে প্রিয়নবির সুন্নাহকে। কুরআন কারীমে এমনটাই বলা হয়েছে। দেখুন,

وَإِن تَلْوُۥٓا۟ أَوْ تُعْرِضُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

'আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলো কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে (জেনে রেখো,) আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত।'[২৮]

এ আয়াতে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ রহস্য ও তাৎপর্য রয়েছে, যার কয়েকটি উল্লেখ না করলেই নয়। পূর্ণ আয়াতটি হলো :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا۟ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓا۟ أَوْ تُعْرِضُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥

'হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতার এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে ধনী বা দরিদ্র যা-ই হোক, আল্লাহ (তোমাদের চেয়ে) তাদের বেশি কল্যাণকামী। অতএব, ন্যায়বিচার করতে গিয়ে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ কোরো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলো, কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে (জেনে রেখো,) আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত।'[২৯]

ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা

আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে ন্যায় প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়েছেন; যাকে ইনসাফ বলা হয়। এ আদেশের আলোকে সবার সাথে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বন্ধু কিংবা শত্রুর সাথেও। ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বান্দা দ্বীন-সংক্রান্ত মতামতকে প্রাধান্য দেবে। কারণ তা আল্লাহ তাআলার আদেশ এবং তাঁর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সংবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির অনুসরণ করা, কোনো ব্যক্তিগত মতামতকে রক্ষা করতে গিয়ে রাসূলের সুন্নাহ থেকে সরে যাওয়া—নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার আদেশের সাথে সাংঘর্ষিক। আল্লাহর রাসূলদের আনীত বিধানের পরিপন্থি। আর ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা উম্মাহর মধ্যে রাসূলের প্রতিনিধিত্বকারী নববি ইলমের আমানতপ্রাপ্ত উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব। এ আমানতদারির গুণে গুণান্বিত তাদেরই করা যায়, যারা পূর্ণরূপে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছে। আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর কিতাব ও তাঁর বান্দাদের প্রতি কল্যাণকামী হয়ে নিষ্কলুষ ইনসাফ বজায় রেখেছে। রাসূলের প্রকৃত উত্তরাধিকারী তাদেরকেই বলা যায়।

[২৮] সূরা নিসা, ৪ : ১৩৫
[২৯] সূরা নিসা, ৪ : ১৩৫

পক্ষান্তরে কিছু মানুষ নিজেদের গুরু ও নেতাদের, নিজেদের দল ও মতাদর্শকে হকের মানদণ্ড বানিয়ে নিয়েছে। কারও সাথে নিজেদের মতাদর্শ মিললে তবেই তার সাথে বন্ধুত্ব করে। শুধুমাত্র নিজের মতাদর্শের বিপরীতে যাওয়ার কারণে কারও সাথে শত্রুতা পোষণ করে। কোথায় গেল সেই ইনসাফ, যা আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বান্দার ওপর ফরয করেছেন? এটাই তো সবচেয়ে বড় দায়িত্ব এবং মহাকর্তব্য।

এরপর আল্লাহ তাআলা বলছেন, **'আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ।'** সাক্ষ্য দেওয়া মানে তো কোনো বিষয়ে সংবাদ দেওয়া। এখন সাক্ষ্যদাতা যদি সত্য সংবাদ দেয়, তবে সে ন্যায়ের পক্ষে। পক্ষান্তরে অসত্য সংবাদ দেওয়া মানে মিথ্যা ও যুলুমের পক্ষ নেওয়া। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা আদেশ করছেন যে, আমরা সাক্ষ্য ন্যায়সঙ্গতভাবে দেবো, পাশাপাশি আমাদের সাক্ষ্য হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য। অন্য কারও জন্য নয়। আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন,

كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ

'আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে।'[৩০]

তো এই আয়াত দুটিতে চারটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে :

১. ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা,

২. ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা আল্লাহর জন্য হওয়া,

৩. ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দেওয়া এবং

৪. সেটাও আল্লাহর জন্য হওয়া।

সূরা নিসায় ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা ও আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য দেওয়াকে বিশেষায়িত করা হয়েছে। আর সূরা মায়িদায় বিশেষায়িত করা হয়েছে আল্লাহর জন্য অবিচল থাকা ও ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দেওয়াকে। দুই আয়াতে ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিতে উল্লেখ করার মাঝে কুরআনুল কারীমের একটি চমৎকার রহস্যের দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়; যা এখানকার আলোচনার বিষয় নয় বলে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকলাম। এরপর আল্লাহ তাআলা বলছেন, **'যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতার এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়।'**

আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিচ্ছেন বান্দা যেন ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে এবং সাক্ষ্য

[৩০] সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৮

প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যায়ের ওপর অবিচল থাকে। এই ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে যদি তার সবচেয়ে আপন মানুষ পিতা-মাতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে চলে যায়, এমনকি নিজের বিরুদ্ধেও যায়, তবুও যেন সে পিছপা না হয়। কারণ নিজের জীবনের মায়া, কাছের মানুষদের ভালোবাসা—বান্দাকে ন্যায়ের পক্ষে থাকতে বাধা দেয়। বিশেষত যদি সত্য বললে বিপরীত পক্ষে রায় চলে যায়, তখন তো ব্যাপারটি আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এমন কঠিন মুহূর্তে কেবল ওই ব্যক্তিই ন্যায়ের পথে অবিচল থাকতে পারে, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল যার কাছে অন্য সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয়। এই অবস্থায় বান্দা নিজের ঈমানকে পরখ করে দেখতে পারে। জেনে নিতে পারে অন্তরে থাকা ঈমানের হাল-হাকিকত।

এ তো গেল ভালোবাসা আর মায়ার জালে জড়িয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠা থেকে পিছিয়ে না পড়ার আলোচনা। এবার দেখি ঘৃণা ও ক্ষোভের জায়গাটা। বান্দা তার বিরোধী পক্ষের লোকের ব্যাপারে এমনকি শত্রুর ব্যাপারেও ইনসাফ বজায় রাখবে। পিতা-মাতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে গেলেও তাদের ভালোবাসার জালে আটকে গিয়ে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা থেকে যেমন বিরত থাকবে না; তেমনি ঘৃণার কারণে কারও প্রতি যুলুম করে বসবে না। মোটকথা, কারও প্রতি ঘৃণা যেন কোনো অন্যায় কাজে তাকে প্ররোচিত না করে। তেমনি কারও প্রতি ভালোবাসাও যেন ন্যায় থেকে দূরে সরিয়ে না রাখে। যেমনটি একজন সালাফ বলতেন, 'ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি রাগান্বিত হলে, তার রাগ তাকে দিয়ে কোনো অন্যায় কাজ করাতে পারে না। আবার কারও প্রতি সন্তুষ্টি হলে, তার সন্তুষ্টি তাকে হক থেকে বিচ্যুত করতে পারে না।'[৩১]

তো এই আয়াত দুটি থেকে দুইটি বিধান পাওয়া যায়,

১. ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা এবং
২. শত্রুমিত্র সবার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দেওয়া।

এরপর আল্লাহ তাআলা বলছেন, **'সে ধনী বা দরিদ্র যাই হোক, আল্লাহ (তোমাদের চেয়ে) তাদের বেশি কল্যাণকামী।'** অর্থাৎ যার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে হবে, হতে পারে সে ধনী। তার থেকে উপকার লাভের আশায় তোমরা সাক্ষ্য দেওয়া থেকে পিছিয়ে যেতে পার। হতে পারে সে দরিদ্র, যার কাছে তোমাদের কোনো কিছু পাওয়ার আশা নেই বা তাকে তোমরা ভয় করো না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তোমাদের তুলনায় তাদের বেশি কল্যাণকামী। তিনি তাদের উভয় শ্রেণীর প্রতিপালক, উভয় শ্রেণীর

---

[৩১] ইহয়াউ উলূমিদ্দীন : ৩/১৭৬-এ মুহাম্মাদ ইবনু কাব-এর সূত্রে এবং আল মুজামুস সগীর লিততাবারানি, পৃষ্ঠা নং : ১১৪-এ আনাস ﷺ-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

মনিব। তোমরা যেমন আল্লাহর বান্দা, তেমনি তারাও তো আল্লাহরই বান্দা। কাজেই ধনীর সম্পদের দিকে আকৃষ্ট হয়ে, কিংবা দরিদ্রের গরিবি হালতের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে, কোনো অবস্থাতেই কারও পক্ষপাতিত্ব করবে না। কারণ তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা তোমাদের চেয়ে বেশি কল্যাণকামী।

আরেকটু ভেঙে বললে, কখনও কখনও আমরা ধনী ও দরিদ্রের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে কিংবা ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে ভয় পাই। ধনীর ক্ষেত্রে তার সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর দরিদ্রের ক্ষেত্রে আশঙ্কা থাকে যে, সে আরও অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়বে। এসব কারণে অন্তরে সহানুভূতি তৈরি হয়। ফলে আমরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। এজন্যই আমাদেরকে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা ধনী-গরিব সবার ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে বেশি কল্যাণকামী। তাদের কল্যাণ-অকল্যাণের বিষয়ে তোমাদের চেয়ে তিনি বেশি অবগত এবং তাদের প্রতি তোমাদের চেয়ে বেশি দয়াশীল। অতএব ধনী-গরিব কারও ক্ষেত্রেই ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় পিছপা হয়ো না।

প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত থাকা

তারপর আল্লাহ তাআলা বলছেন, **'অতএব ন্যায়বিচার করতে গিয়ে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ কোরো না।'** মহান আল্লাহ প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে নিষেধ করছেন, যা ন্যায়বিচার করতে বাধা প্রদান করে। বসরার ব্যাকরণবিদদের মতে এ আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়—ন্যায়বিচার করে ফেলবে এই ভয়ে, অথবা ন্যায়বিচারকে অপছন্দ করে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ কোরো না। প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করার মানে হলো, ন্যায়ের প্রতি ঘৃণা এবং ইনসাফ থেকে পালিয়ে যাওয়ার মানসিকতা তোমার মধ্যে রয়েছে। আর কুফার ব্যাকরণবিদদের মতে এ আয়াতের ব্যাখ্যা হবে—ন্যায়বিচার না করার উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তির অনুসরণ কোরো না। তবে বসরার ব্যাকরণবিদদের ব্যাখ্যাই এখানে বেশি সুন্দর ও জুতসই।

আল্লাহ তাআলা এরপর বলছেন, **'আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলো, কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে (জেনে রেখো,) আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত।'** আল্লাহ তাআলা এখানে সত্য গোপন করার দুটি পন্থা উল্লেখ করে সেগুলো থেকে সতর্ক করেছে।

১. বক্রতা (ঘুরানো-পেঁচানো)

২. উপেক্ষা করা (পাশ কাটিয়ে যাওয়া)।

যখন সত্য ও ন্যায় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়, ফন্দিবাজরা তখন হককে প্রতিহত করার উপায় খুঁজে না পেয়ে বোবা শয়তানের মতো নিরবে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। আবার কখনও হকের প্রমাণাদিকে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করার চেষ্টা করে। অপব্যাখ্যা করে এর মর্মার্থ বিকৃত করার প্রয়াস চালায়। এটি আবার দুইভাবে হতে পারে—

ক) শব্দের বিকৃতি : শব্দের ক্ষেত্রে বিকৃতির উদাহরণ হলো, শব্দকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে উপস্থাপন করা। এক শব্দের জায়গায় আরেক শব্দ বলা বা নিজের মতো বাড়িয়ে কমিয়ে বলা, কিংবা শব্দকে এমনভাবে উপস্থাপন করা, যেন শ্রোতারা ধোঁকায় পড়ে যায়। যেমন, নবি ﷺ-কে সালাম দেওয়ার সময় ইয়াহূদিরা মুখ বাঁকিয়ে 'আসসামু আলাইকুম' বলত।[৩২]

খ) অর্থের বিকৃতি : আবার কখনও এই বিকৃতি সাধন করা হয় মর্মার্থ ও উদ্দেশ্য বোঝানোর ক্ষেত্রে। যেমন : কোনো বক্তব্যকে বক্তার উদ্দেশ্যের বিপরীত অর্থে ব্যাখ্যা করা, আংশিক মর্মার্থ উপস্থাপন করা ইত্যাদি।

এই দুই পদ্ধতিতে হকের প্রমাণকে বিকৃত করা হয়। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, **'আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলো, কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে (জেনে রেখো,) আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কর্ম সম্পর্কেই অবগত।'** সুতরাং আয়াতের দাবি অনুসারে সাক্ষ্যদানকারী ব্যক্তি যথাযথভাবে সাক্ষ্যদানের কাজটি সম্পন্ন করবে। না তার কিছু গোপন করার অধিকার আছে, আর না পরিবর্তন করার অধিকার আছে। গোপন করার উদাহরণ হচ্ছে 'উপেক্ষা করা'র বিষয়টি। আর পরিবর্তনের উদাহরণ হচ্ছে 'ঘুরানো পেঁচানো'র বিষয়টি।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথাই চূড়ান্ত দলিল

দুটি বিষয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম। পুরো আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, বান্দা শারীয়াতের দলিল পেলে, তা বিনাবাক্যে মেনে নেবে, প্রকাশ্যে স্বীকার করবে এবং মানুষকে সে দিকে আহ্বান করবে। উপেক্ষা বা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে না। পূর্ণ ঈমানদার হতে হলে, এমনকি ঈমানদার নামের হক আদায় করতে এর কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ

[৩২] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ২৯৩৫, ৬০২৪; সহীহ মুসলিম. হাদীস নং : ২১৬৫

مِنْ أَمْرِهِمْ

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো কাজের নির্দেশ দিলে, কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না।'[৩৩]

অতএব এটাই প্রমাণিত হয়, যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে কোনো বিধান আসে—হোক তা আদেশ-নিষেধ কিংবা সংবাদমূলক—সেখানে মুমিন বান্দার এর বিপরীতে অন্যকিছু গ্রহণ করার অধিকার থাকে না। আদতে কোনো ঈমানদার নর-নারী এমনটা করতেই পারে না। এটা ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক।

ইমাম শাফিয়ি ﷀ সাহাবা, তাবিয়ি ও পরবর্তী সালাফদের থেকে এ মর্মে ইজমা বর্ণনা করেছেন, যার কাছে কোনো বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ স্পষ্ট হয়ে যাবে, তার জন্য অন্য কারও কথার ওপর ভিত্তি করে সেই সুন্নাহ ত্যাগ করার কোনো জো নেই।

ইমাম শাফিয়ির এই কথার বিশুদ্ধতা পরবর্তী সকল ইমামগণ দ্বিধাহীনভাবে মেনে নিয়েছেন। কারণ সেই মহান মানুষের কথাই অকাট্য দলিল, সমগ্র মানবজাতির ওপর তা মেনে নেওয়া আবশ্যক, যিনি সব ধরনের পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত, পবিত্র ও নিষ্পাপ। যিনি প্রবৃত্তির তাড়না থেকে কোনো কথা বলেন না। পক্ষান্তরে তিনি ছাড়া অন্য সবার কথার সর্বোচ্চ অবস্থান হচ্ছে, তা অনুসরণের 'উপযুক্ত', ব্যস। সে-সবকে রাসূলের সুন্নাহর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া কিংবা সুন্নাহর ওপর প্রাধান্য দেওয়া তো বহুত দূর কি বাত! আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ ধরনের পদস্খলন থেকে হিফাযত করুন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۟ ۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

'বলুন, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো। তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তিনিই দায়ী এবং তোমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী। আর তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে। মূলত রাসূলের দায়িত্ব তো শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া।'[৩৪]

---

[৩৩] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৬

[৩৪] সূরা নূর, ২৪ : ৫৪

আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, হিদায়াত একমাত্র রাসূলের আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত, অন্য কারও মধ্যে নয়। আল্লাহ এখানে শর্তযুক্ত করে দিয়েছেন, 'যদি তাঁর আনুগত্য করো, তবে হিদায়াত পাবে।' সুতরাং রাসূলের আনুগত্য যেখানে নেই, সেখানে হিদায়াতও নেই। বরং তা প্রবৃত্তির অনুসরণ ছাড়া কিছু নয়।

আয়াতে 'আনুগত্য করা' ক্রিয়াপদটি দ্বিরুক্ত না করে একবার উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হতো। তা এভাবে যে, **'তোমরা আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করো।'** এই দ্বিরুক্তিকরণের বিষয়টিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এ সম্পর্কে আমরা সামনে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন, **'তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তিনি দায়ী এবং তোমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী।'** এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অর্পিত রিসালাতের বাণী প্রচার করা, মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া। আর তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে রাসূলকে সত্যায়ন করা। আনুগত্যের চাদর বিছিয়ে তাঁর কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া। যেমনটি ইমাম যুহরি ؒ বলেছেন: 'আল্লাহর পক্ষ থেকে বয়ান এসেছে। রাসূলের দায়িত্ব তা পৌঁছে দেওয়া, আর আমাদের দায়িত্ব তা মেনে নেওয়া।'[৩৫] এখন তোমরা যদি নিজেদের দায়িত্ব পালন না করো, ঈমান না আন এবং রাসূলের আনুগত্য না করো, তবে তাতে তোমাদেরই ক্ষতি; রাসূলের নয়। কারণ তার দায়িত্ব তো ছিল কেবল তোমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া; তোমাদেরকে ঈমানদার বানিয়ে দেওয়া নয়। **'মূলত রাসূলের দায়িত্ব তো শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া।'** তোমাদের হিদায়াত বা তাওফীক দেওয়ার দায়িত্ব তাঁর নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ۝٥٩

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো ও আনুগত্য করো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যকার কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের। যদি কোনো

---

[৩৫] সহীহ বুখারি : ১৩/৫০৩

বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সেই বিষয়কে আল্লাহ এবং রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখিরাত-দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাকো। এটাই উত্তম এবং সুন্দরতম পরিণাম।'[৩৬]

'হে ঈমানদার' বলার কারণ

আল্লাহ তাআলা প্রথমে আমাদেরকে **'হে ঈমানদার'** বলে সম্বোধন করলেন। তারপর তাঁর আনুগত্য ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দিলেন। 'ঈমানদার' বলে সম্বোধন করার দ্বারা, আল্লাহ তাআলা সচেতন করছেন। যে ঈমানের দিকে সম্পৃক্ত করে ডাক দেওয়া এবং সম্বোধন করা হয়েছে, সেই ঈমানের দাবি তো এটাই যে, তোমরা এ আদেশ পালন করবে। এটি একটি ভাষাগত সৌন্দর্যও বটে। যেমনটি বলা হয়, 'হে আল্লাহর দয়া ও নিয়ামাতে ধন্য বান্দা! আল্লাহ তাআলা যেভাবে তোমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন, তুমিও তেমনি (তাঁর সৃষ্টির ওপর) অনুগ্রহ করো।' 'ওহে জ্ঞানী ব্যক্তি! মানুষকে উপকারী জ্ঞান শিক্ষা দিন।' 'হে বিচারক! ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করুন।' ইত্যাদি।

কুরআনুল কারীমের যেসব জায়গাতে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের মৌলিক বিধিবিধানের কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানেই 'হে ঈমানদারগণ' বলে সম্বোধন করেছেন। যেমন :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সাওম ফরয করা হয়েছে।'[৩৭]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ

'হে ঈমানদারগণ! যখন জুমুআর দিন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়...।'[৩৮]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের কৃত অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো।'[৩৯]

এভাবে সম্বোধন করার তাৎপর্য এই যে, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো, তবে ঈমানের দাবি হচ্ছে তোমরা এই এই কাজ করবে।

---

[৩৬] সূরা নিসা, ৪ : ৫৯
[৩৭] সূরা বাকারাহ, ২ : ১৮৩
[৩৮] সূরা জুমুআহ, ৬২ : ৯
[৩৯] সূরা মায়িদাহ, ৫ : ১

আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য

এরপর আল্লাহ তাআলা বলছেন, **'আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো।'** এখানে একটি সূক্ষ্ম তাৎপর্য রয়েছে, যার ইঙ্গিত আমরা ইতিপূর্বে দিয়েছিলাম। আল্লাহ তাআলা এখানে এভাবে বলতে পারতেন, *'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো।'* কিন্তু তা না করে ক্রিয়াপদকে দ্বিরুক্ত করে ও রাসূলের আনুগত্যের কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি সূক্ষ্মভাবে ইশারা দিলেন যে, আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য স্বতন্ত্রভাবেই আবশ্যক। এজন্যই কোনো বিষয়ে নবিজির কাছ থেকে আদেশ/নিষেধ পাওয়া গেলে, এবং কুরআন কারীমে সে বিষয়টা হুবহু উল্লেখ না থাকলেও, তাঁর হুকুম গ্রহণ করতে হবে ও আবশ্যকীয়ভাবে আমল করতে হবে। কুরআনে নেই, এ অজুহাতে তা পরিত্যাগ করা চলবে না। কারণ রাসূলের আনুগত্য মানে আল্লাহর আনুগত্য—একথাই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। কিছু নির্বোধ এমনটা ধারণা করে থাকে, রাসূল ﷺ কোনো ব্যাপারে নির্দেশ দিলে সেটা যদি কুরআনে বর্ণিত না থাকে, তবে তার আনুগত্য আবশ্যক নয়! নবিজি ﷺ নিজেই (এই লোকদের সম্পর্কে সতর্ক করে) গেছেন,

يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيْهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِيْ فَيَقُوْلُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ، مَا وَجَدْنَا فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ اتَّبَعْنَاهُ، أَلَا وَإِنِّيْ أُوْتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

'এমন একটা সময় আসবে যখন কোনো প্রাচুর্যবান লোক তার আসনে উপবেশন করবে। তার কাছে আমার কোনো আদেশ এলে সে বলবে, "আমাদের এবং তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট। আমরা কেবল তা-ই অনুসরণ করব, যা এতে পাব।" জেনে রাখো! আমাকে কিতাব এবং তার সঙ্গে অনুরূপ একটি (অর্থাৎ সুন্নাহ) দেওয়া হয়েছে।'[৪০]

কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আনুগত্য

এবার আসি 'উলুল আমর' তথা কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আনুগত্য প্রসঙ্গে। তাদের কারও আনুগত্য রাসূলের আনুগত্য অনুযায়ী হলে, তা মেনে নেওয়া আবশ্যক। তবে তাদের আনুগত্য করা স্বতন্ত্র কোনো ফরয নয়। যেমনটা নবি ﷺ থেকে বিশুদ্ধ

[৪০] মুসনাদে আহমাদ : ৪/১৩২; সুনানু দারিমি : ৫৯২; তিরমিযি : ২৬৬৪, ইবনে মাজাহ : ১২

সূত্রে বর্ণিত হয়েছে,

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

'মুসলিম ব্যক্তির অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক প্রিয় এবং অপ্রিয় ব্যাপারে (দায়িত্বশীলের) আনুগত্য করা, যতক্ষণ না তাকে আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ করা হয়। যদি আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ করা হয়, তাতে আনুগত্য (করার বিধান) নেই।'[৪১]

খেয়াল করুন, আয়াতের পরবর্তী অংশে অর্থাৎ **'আল্লাহ এবং রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও'**—এখানে ঠিক একই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এখানে বলা হয়নি, 'আল্লাহর দিকে এবং তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।' কারণ আল্লাহর দিকে ফেরানো, আর রাসূলের দিকে ফেরানো একই কথা। কুরআনের দিকে ফেরানো হলে তার অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল—উভয়ের দিকে ফেরানো। আবার সুন্নাহর দিকে ফেরানো মানেও আল্লাহ ও রাসূল—উভয়ের দিকেই ফেরানো। সুতরাং, আল্লাহ তাআলা কোনো বিষয়ে বিধান দিলে, সেটা তাঁর রাসূলেরও বিধান। আবার রাসূল ﷺ কোনো বিষয়ে বিধান দিলে, সেটাও স্বয়ং আল্লাহর বিধান বলেই গণ্য হবে। কাজেই, আমরা যদি মতভেদের জায়গাগুলো আল্লাহর দিকে অর্থাৎ তাঁর কিতাবের দিকে ফিরিয়ে দিই, তবে আমরা আল্লাহ এবং রাসূল উভয়ের দিকে ফেরালাম। আবার যদি রাসূলের দিকে অর্থাৎ তাঁর সুন্নাহর দিকে ফিরাই, তবে সেটা আল্লাহর দিকেই ফিরিয়ে দেওয়া বলে গণ্য হবে। এই বিষয়টি কুরআনের অন্যতম সূক্ষ্ম তাৎপর্য।

উলুল আমরের পরিচয়

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ﵀ 'উলুল আমর' বা কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তি সম্পর্কে দুটি মত বর্ণনা করেছেন। প্রথম মতানুসারে কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তি হচ্ছেন আলেমগণ। আর দ্বিতীয় মতানুসারে (ইসলামি) শাসকবৃন্দ।[৪২] এই আয়াতের তাফসীরে দুটি মতই

[৪১] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৮৩৯; সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৭১৪৪

[৪২] শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ﵀ বলেছেন, ইমাম আহমাদ ﵀সহ অনেকেই উভয় দলকেই উলুল আমর আখ্যা দিয়েছেন। কারণ আল্লাহর নির্দেশের অনুগামী হলে উভয় দলের কথাই মান্য করা আবশ্যক। নবি ﷺ-এর জীবদ্দশাতে এবং তাঁর পরবর্তী খলিফাদের যুগে উভয় দলই একত্রে ছিলেন। -মাজমূউল ফাতাওয়া : ১৮/১৫৮

সাহাবায়ে কেরাম ﷺ থেকে প্রমাণিত।[৪৩] বাস্তবতা হচ্ছে, এখানে দুই দলই অন্তর্ভুক্ত হবেন।

১. উলামায়ে কেরাম,

২. (ইসলামি বিধান প্রয়োগকারী) শাসক।

কারণ, রাসূল ﷺ-এর আনীত দ্বীনের কর্তৃত্ব উলামা এবং শাসক—উভয় শ্রেণীর ওপরই ন্যাস্ত।

১. উলামায়ে কেরাম : উলামাগণ দ্বীনের বিষয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ করেন। মানুষকে দ্বীনের কথাগুলো বয়ান করে বুঝিয়ে দেন এবং বাতিলপন্থিদের খণ্ডন করেন। কেউ সংশয় সৃষ্টি করলে, দ্বীনের বিকৃতি ঘটাতে চাইলে, বা রিদ্দার পথে হাঁটলে, তাদের অপনোদন করেন। এসব বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলাই তাদেরকে দায়িত্ব প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ۝

'সুতরাং যদি এরা এগুলোকে প্রত্যাখ্যানও করে, তবে আমি এমন এক সম্প্রদায়ের প্রতি এগুলোর দায়িত্ব অর্পণ করেছি—যারা তা প্রত্যাখ্যান করবে না।'[৪৪]

বস্তুত এটা এক মহান দায়িত্ব, যার অধিকারীদের আনুগত্য করা এবং তাদের শরণাপন্ন হতে লোকে বাধ্য। আর সাধারণ মানুষের তো তাদের অনুসরণ না করে উপায় নেই।

২. (ইসলামি বিধান প্রয়োগকারী) শাসক : শাসকদের দায়িত্ব হচ্ছে দ্বীনের বিষয়াদি বাস্তবায়ন করা, পৃষ্ঠপোষণ করা, রাষ্ট্রে দ্বীন কায়েম করা, জিহাদে নেতৃত্ব দেওয়া এবং দ্বীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের দমন করা।

এই দুই শ্রেণীর মানুষ কর্তৃস্থানীয়/উলুল আমর। অন্য সবাই তাদের অনুসারী আর অধীনস্থ।

---

[৪৩] তাফসীরুত তাবারি : ৫/৯৩-৯; তাফসীরুল কুরতুবি : ৫/২৫৯-২৬০; আদদুররুল মানছূর : ২/৫৭৩-৫৭৬

[৪৪] সূরা আনআম, ৬ : ৮৯

মতভেদ ঘটলে করণীয়

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন, **'যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ এবং রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখিরাত-দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাকো।'** দ্বীনি কোনোকিছু নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়লে, তার প্রতিটি বিষয়ই যে আমরা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য—এ আয়াতটি তার অকাট্য প্রমাণ। অতএব আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফেরাতে যে বাধা দেবে, সে আল্লাহর আদেশের বিপরীত কাজ করবে। বিতর্কের সময় আল্লাহ ও রাসূলকে বাদ দিয়ে অন্যের ফায়সালার প্রতি যে আহ্বান করে, তার এই আহ্বান জাহিলিয়্যাতের আহ্বান ছাড়া কিছু নয়। মোটকথা, বান্দা যতক্ষণ না নিজেদের মতবিরোধ আর বিতর্কের জায়গাগুলোতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দ্বারস্থ না হবে, ততক্ষণ ঈমানদার হতে পারবে না। এজন্যই আল্লাহ তাআলা শর্তারোপ করে বলেছেন, **'যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাকো...।'**

বিষয়টি আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি যে, শর্ত চলে গেলে শর্তাধীন বিষয়টির অস্তিত্বও নেই বলেই ধর্তব্য হবে। এর দ্বারা বোঝা যায়, যে ব্যক্তি মতবিরোধের স্থানে কিংবা জীবন সমস্যার সমাধানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাড়া অন্য কোনো পথ এবং মতকে ফায়সালাকারী নিযুক্ত করে, আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের দিবসের প্রতি তাঁর ঈমান মূল্যহীন। সে ব্যক্তি ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়।

এই আয়াতটি যে কতটা তাৎপর্যপূর্ণ, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কুরআন-হাদীসের দলিলকে ইনিয়ে-বিনিয়ে বিরোধিতাকারীদের গোমর ফাঁস করতে এবং কিতাব-সুন্নাহকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরা মুমিনদেরকে সত্যায়ন করতে, এই আয়াতটি সত্যিই অনন্য।

لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنۢ بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

'যে ধ্বংস হওয়ার, সে যাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর ধ্বংস হয়। আর যে জীবিত থাকার, সে যাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর বেঁচে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।'[৪৫]

সকল উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, আল্লাহর কাছে দ্বারস্থ হওয়ার অর্থ

---

[৪৫] সূরা আনফাল, ৮ : ৪২

হচ্ছে তাঁর কিতাবের দ্বারস্থ হওয়া। আর রাসূলের কাছে দ্বারস্থ হওয়ার অর্থ হচ্ছে নবিজির জীবদ্দশায় তাঁর কাছে এবং ওফাতের পর তাঁর সুন্নাহর দ্বারস্থ হওয়া।

সুন্দরতম পরিণতি

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলছেন, **'এটাই উত্তম এবং সুন্দরতম পরিণাম।'** অর্থাৎ, 'তোমাদেরকে আমার আনুগত্য ও আমার রাসূলের আনুগত্য এবং কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আনুগত্যের নির্দেশ দিলাম। তোমাদের জীবনের সমস্যার সমাধানে আমার ও আমার রাসূলের দ্বারস্থ হবে। এগুলো মূলত তোমাদের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের জন্যই। তোমাদের উভয় জগতের সফলতা এখানেই—আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে। ফায়সালা দেওয়ার একমাত্র অধিকার আহকামুল হাকিমীন ও তাঁর হাবীবের জন্য সংরক্ষিত রাখার মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ।'

আমরা যদি বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির দিকে তাকাই, যাবতীয় অন্যায় আর অকল্যাণ নিয়ে চিন্তা করি, তবে তার মূল কারণ হলো, রহমাতুল্লিল আলামীনের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া। যতটুকু কল্যাণ অবশিষ্ট আছে, তা রাসূলের অনুসরণের বরকতে। একইভাবে পরকালের অকল্যাণ, শাস্তি এবং যাবতীয় দুর্যোগও আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর অবাধ্যতা ও তাঁর বিরোধিতারই ফলাফল। মানুষ যথাযথভাবে আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করলে, এ জগতে আর কোনো অকল্যাণ থাকত না। এটা যেমন সার্বজনীন বালা-মুসিবত ও দুর্যোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনিভাবে বান্দার অভ্যন্তরীণ দুঃখ-কষ্ট ও চিন্তা-পেরেশানির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা এই দুটিই সংঘটিত হয় নববি আদর্শের উলটা পথে হাঁটার কারণে। আর নববি আদর্শ হচ্ছে এমন এক দুর্গ, সেখানে প্রবেশ করার অর্থই হচ্ছে নিজেকে নিরাপত্তার চাদরে আবৃত করে নেওয়া। এটা এমন এক গুহা, যেখানে আশ্রয় নেয়ার অর্থই হচ্ছে সব ধরনের অকল্যাণ এবং অনিষ্ট থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা।

অতএব দুনিয়া ও আখিরাতের সর্ব প্রকার অকল্যাণের কারণ একটা—রাসূলের আনীত আদর্শের ব্যাপারে অজ্ঞতা ও সে আদর্শ থেকে বিচ্যুতি। বান্দার মুক্তির পথ একটাই—তাকে আল্লাহর রাসূলের আদর্শকে জানতে এবং তা আমলে বাস্তবায়িত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। এটাই তার সৌভাগ্যের সোপান। তবে এই সৌভাগ্য ও কল্যাণের পূর্ণতা পেতে আরও দুটি বিষয় প্রয়োজন।

প্রথমত, মানুষকে এই আদর্শের দিকে দাওয়াত দেওয়া। দ্বিতীয়ত, সে দাওয়াতের ক্ষেত্রে ধৈর্য্য এবং অবিচলতার পরিচয় দেওয়া।

সুতরাং মানব জীবনের পূর্ণতা এই চার স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ :

১. রাসূলের আদর্শকে জানা,

২. কাজেকর্মে সুন্নাহর বাস্তবায়ন,

৩. মানুষের মাঝে সুন্নাহর প্রচার-প্রসার ও মানুষকে সেদিকে আহ্বান করা,

৪. এ দায়িত্ব পালনে চেষ্টা-সাধনা করা এবং ধৈর্যের পরিচয় দেওয়া।

সুতরাং যে ব্যক্তি সাহাবিদের পথ জানতে চায়, তাদেরকে অনুসরণের ইচ্ছা করে, তাদের পথ এটাই। তাদের সাথে সম্পর্ক জুড়তে চাইলে তাদের পথে চলা শুরু করুন। দেখবেন, সে পথ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

বিভ্রান্তদের পরিণাম

রাসূল ﷺ-কে লক্ষ করে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِى ۖ وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِىٓ إِلَىَّ رَبِّىٓ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۝٥٠

‘বলুন, আমি বিভ্রান্ত হলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই। আর যদি আমি সৎপথে থাকি, তবে তা এ জন্য যে, আমার রব আমার প্রতি ওহি পাঠান। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, অতি নিকটবর্তী।’[৪৬]

একেবারে স্পষ্ট কথা। স্বয়ং রাসূল ﷺ-ও ওহির মাধ্যমে সৎপথ লাভ করে থাকেন। সেখানে অন্যরা কীভাবে ওহি বাদ দিয়ে বিশৃঙ্খল নানাবিধ মতামত, চিন্তা ও দর্শনের মাধ্যমে পথ খুঁজে পাবে? এ তো বড়ই আজীব ব্যাপার! কিন্তু সত্য কথা এটাই যে,

مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۝١٧

‘আল্লাহ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সে-ই সৎপথপ্রাপ্ত। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি কখনও তার জন্য কোনো পথনির্দেশক অভিভাবক পাবেন না।’[৪৭]

ওই ব্যক্তির ভ্রষ্টতার চেয়ে নিকৃষ্ট কাজ আর কী হতে পারে, যে কিনা ওহির মাধ্যমে সৎপথের দিশা খোঁজে না! ফলে সে অমুকের মতাদর্শ, তমুকের চিন্তাধারার দ্বারস্থ

---

[৪৬] সূরা সাবা, ৩৪ : ৫০

[৪৭] সূরা কাহফ, ১৮ : ১৭

হয়। কোন স্যার কী বলল, সেদিকে চেয়ে থাকে। যে বান্দাকে আল্লাহ তাআলা এ মহা মুসিবত ও ভয়ানক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করেছেন, বাস্তবিকই সে রবের পক্ষ থেকে বিরাট নিয়ামাত লাভ করেছে। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

كِتَٰبٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِى صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِۦ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝٢ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝٣

'এটি কিতাব, যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং তার সম্পর্কে তোমার মনে যেন কোনো সংকীর্ণতা না থাকে। যাতে তুমি তার মাধ্যমে সতর্ক করতে পার এবং তা মুমিনদের জন্য উপদেশ। তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যা নাযিল করা হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ করো এবং তাঁকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ কোরো না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করো।'[৪৮]

রাসূলের ওপর যা নাযিল করা হয়েছে তার অনুসরণ করতে এবং এ ছাড়া অন্য কিছুর অনুসরণ না করতে আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন। অপশন দুইটি : হয়ত নাযিলকৃত ওহির অনুসরণ, নয়ত আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে অভিভাবক মেনে নিয়ে তার অনুসরণ। এর মাঝামাঝি কোনো অপশন নেই। অতএব যে ব্যক্তি ওহির অনুসরণ করে না, সে বাতিল (মতবাদ) এবং অসত্যের অনুসরণ করে। অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও আনুগত্য করে। এটা একেবারে সুস্পষ্ট বিষয়, এতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। প্রশংসা আল্লাহর দরবারে।

وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَٰلَيْتَنِى ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۝٢٧ يَٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۝٢٨ لَّقَدْ أَضَلَّنِى عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِى ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِلْإِنسَٰنِ خَذُولًا ۝٢٩

'যালিম ব্যক্তি সেদিন নিজের হাত দুটি কামড়াতে কামড়াতে বলবে, "হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম! হায়, দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! আমাকে তো সে বিভ্রান্ত

[৪৮] সূরা আরাফ, ৭ : ২-৩

করেছিল, আমার কাছে উপদেশ পৌঁছার পর। শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।'[৪৯]

তাই যে ব্যক্তি রাসূলকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তার মতামতকে গ্রহণ করার জন্য রাসূলের আনীত বিধানকে উপেক্ষা করে, কিয়ামাতের দিন নিঃসন্দেহে সে এভাবে আফসোস করতে থাকবে। এজন্যই এই বন্ধুকে আল্লাহ তাআলা 'অমুক' বলে পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছেন। কারণ, দুনিয়াতে আল্লাহকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন নামের অমুক তমুককেই তো অভিভাবক হিসেবে অনুসরণ করা হয়।

রাসূলের আনুগত্যের বিপরীতে বন্ধুত্বকারীদের অবস্থা এমনই হবে। তাদের বন্ধুত্বের শেষ পরিণতি হবে শত্রুতা আর অভিসম্পাত দিয়ে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন,

ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾

'বন্ধুরা সেদিন হয়ে পড়বে একে অন্যের শত্রু, মুত্তাকিরা ছাড়া।'[৫০]

(রাসূলকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো মতবাদের) অনুসারী এবং অনুসৃতদের অবস্থা আল্লাহ তাআলা একাধিক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে,

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَـٰلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا۠ ﴿٦٦﴾ وَقَالُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠ ﴿٦٧﴾

'যেদিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনে উলট-পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, "হায়, আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম ও রাসূলকে মেনে নিতাম!" তারা আরও বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো আমাদের নেতা ও বড় বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল।"'[৫১]

মানুষ সেদিন আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য না করার কারণে আক্ষেপ করবে। কিন্তু এ আক্ষেপ তাদের কোনো কাজে আসবে না। তারা অজুহাত পেশ করবে—তারা তাদের মুরুব্বি ও নেতৃস্থানীয়দের অনুসরণ করত। তারা স্বীকারোক্তি

[৪৯] সূরা ফুরকান, ২৫ : ২৭-২৯
[৫০] সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৬৭
[৫১] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৬৬-৬৭

দেবে যে, এ ব্যাপারে আসলে তাদের কোনো ওজর ছিল না। রাসূলকে অমান্য করে তারা যে মুরুব্বি এবং নেতৃস্থানীয়দের অনুসরণ করেছে, এই আনুগত্য এবং সম্পর্কের পরিণতি শেষ হবে এ কথা বলে :

رَبَّنَآ ءَاتِهِمۡ ضِعۡفَيۡنِ مِنَ ٱلۡعَذَابِ وَٱلۡعَنۡهُمۡ لَعۡنٗا كَبِيرٗا ﴿٦٨﴾

'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদেরকে দিন মহা অভিশাপ।'[৫২]

বিবেকবানরা চাইলে এই আলোচনা থেকে চমৎকার উপদেশ গ্রহণ করতে পারবেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوۡ كَذَّبَ بِـَٔايَٰتِهِۦٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ يَنَالُهُمۡ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوۡنَهُمۡ قَالُوٓاْ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِۖ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ أَنَّهُمۡ كَانُواْ كَٰفِرِينَ ﴿٣٧﴾ قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَمٖ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ فِي ٱلنَّارِۖ كُلَّمَا دَخَلَتۡ أُمَّةٞ لَّعَنَتۡ أُخۡتَهَاۖ حَتَّىٰٓ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعٗا قَالَتۡ أُخۡرَىٰهُمۡ لِأُولَىٰهُمۡ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ أَضَلُّونَا فَـَٔاتِهِمۡ عَذَابٗا ضِعۡفٗا مِّنَ ٱلنَّارِۖ قَالَ لِكُلّٖ ضِعۡفٞ وَلَٰكِن لَّا تَعۡلَمُونَ ﴿٣٨﴾ وَقَالَتۡ أُولَىٰهُمۡ لِأُخۡرَىٰهُمۡ فَمَا كَانَ لَكُمۡ عَلَيۡنَا مِن فَضۡلٖ فَذُوقُواْ ٱلۡعَذَابَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡسِبُونَ ﴿٣٩﴾

'যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করে কিংবা তাঁর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? তাদের জন্য যে হিসসা লেখা আছে, তা তাদের কাছে পৌঁছবে। যতক্ষণ না আমার ফেরেশতাগণ তাদের জান কবজের জন্য তাদের কাছে আসবে ও জিজ্ঞেস করবে, "আল্লাহর পরিবর্তে যাদের তোমরা ডাকতে তারা কোথায়?" তারা বলবে, "তারা আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে।" তারা স্বীকার করবে, নিশ্চয়ই তারা কাফির ছিল। আল্লাহ বলবেন, "তোমাদের আগে যে জিন ও মানুষেরা গত হয়েছে, তাদের সাথে তোমরা আগুনে প্রবেশ করো।" যখনই কোনো দল তাতে প্রবেশ করবে, তখনই অন্য দলকে তারা অভিসম্পাত করবে। অবশেষে সবাই তাতে একত্র হবে। তখন পরবর্তীরা তাদের পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল। কাজেই

[৫২] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৬৮

> এদেরকে দ্বিগুণ আগুনের শাস্তি দিন।” আল্লাহ বলবেন, “প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রয়েছে, কিন্তু তোমরা জানো না।” আর পূর্ববর্তীরা তাদের পরবর্তীদের বলবে, “আমাদের ওপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কাজেই তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করো।”’[৫৩]

প্রত্যেক বিবেকবান মানুষের উচিত এসব আয়াত ও অন্তর্নিহিত উপদেশগুলো নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা

- আল্লাহ্ তাআলা প্রথমে বলছেন, **‘যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করে কিংবা তাঁর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে?’** এখানে দুই ধরনের বাতিলপন্থার আলোচনা করা হয়েছে।

    ১. বাতিল ও মিথ্যার উদ্ভাবন এবং তা মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা।

    ২. সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

প্রথম প্রকারের কুফরি হয়েছে আল্লাহ্ তাআলার ব্যাপারে মিথ্যা রটনা ও মিথ্যারোপের মাধ্যমে। দ্বিতীয় প্রকারে কুফরি হয়েছে সত্যকে অস্বীকার করার মাধ্যমে। এই দুটি বাতিলপন্থাই সব ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতাকে উসকে দেয়। এর সাথে যদি বাতিলপন্থার দিকে আহ্বান করা এবং মানুষকে হক থেকে বাধা দেওয়া যুক্ত হয়, তবে সে ব্যক্তি দ্বিগুণ শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায়। কারণ তার কুফর আর অনিষ্ট এখানে দ্বিগুণ। এজন্যই আল্লাহ্ তাআলা বলছেন,

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾

> ‘যারা কুফরি করেছে এবং আল্লাহর পথ থেকে বাধা দিয়েছে, আমি তাদের শাস্তির ওপর শাস্তি বাড়িয়ে দেবো। কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত।’[৫৪]

অর্থাৎ কুফরি এবং হকের পথ থেকে মানুষকে বাধা প্রদান করার কারণে তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দেওয়া হবে। একটি আযাব তাদের কুফরির কারণে, অপরটি হকের পথে বাধা সৃষ্টি করার কারণে। এজন্যই আল্লাহ্ তাআলা যেখানে শুধুমাত্র কুফরির কথা উল্লেখ করেন, সেখানে দ্বিগুণ শাস্তির কথা বলেন না।

---

[৫৩] সূরা আরাফ, ৭ : ৩৭-৩৯

[৫৪] সূরা নাহল, ১৬ : ৮৮

যেমন,

وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

'আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'[৫৫]

- এরপর আল্লাহ তাআলা বলছেন, **'তাদের জন্য যে হিসসা লেখা আছে, তা তাদের কাছে পৌঁছবে।'** অর্থাৎ তাদের জন্য রিযক, জীবন-জীবিকাসহ যেসব জাগতিক বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে, তারা সেগুলো পাবে।

- এরপর বলা হয়েছে, **'যতক্ষণ না আমার ফেরেশতাগণ তাদের জান কবজের জন্য তাদের কাছে আসবে ও জিজ্ঞেস করবে, "আল্লাহর পরিবর্তে যাদের তোমরা ডাকতে তারা কোথায়?"'**

  আজ কোথায় তারা, যাদের খাতিরে তোমরা বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা রাখতে? আল্লাহর পরিবর্তে যাদের তোমরা আশা করতে এবং ভয় করতে?

  'তারা বলবে, "তারা আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে।"' অর্থাৎ সেসব আমাদের ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে এবং আমাদের সেই ডাকাডাকি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। **'তারা স্বীকার করবে, নিশ্চয়ই তারা কাফির ছিল। আল্লাহ বলবেন, "তোমাদের আগে যে জিন ও মানুষেরা গত হয়েছে, তাদের সাথে তোমরা আগুনে প্রবেশ করো।"'** অর্থাৎ তাদের সাথে তোমরাও শামিল হয়ে যাও।

- জাহান্নামে ঢোকার পর কী হবে? **'যখনই কোনো দল তাতে প্রবেশ করবে, তখনই অন্য দলকে তারা অভিসম্পাত করবে। অবশেষে সবাই তাতে একত্র হবে। তখন তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের করবে।'**

  আসলে প্রতিটি (বিভ্রান্ত) ব্যক্তিই তার পূর্ববর্তী (কোনো-না-কোনো পথভ্রষ্টের) দ্বারা গোমরাহ হয়েছে। এই জন্য তারা বলবে, **'হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদের গোমরাহ করেছিল; কাজেই এদের দ্বিগুণ আগুনের শাস্তি দিন।'** অর্থাৎ তারা যেহেতু আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল ও আপনার রাসূলদের আনুগত্য করা থেকে আমাদেরকে বাধা দিয়েছিল, সুতরাং আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন।

---

[৫৫] সূরা বাকারাহ, ২ : ১০৪; সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ : ৪

- **'আল্লাহ বলবেন, প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রয়েছে।'** অর্থাৎ অনুসারী এবং অনুসৃতের জন্য নিজ নিজ গোমরাহি ও কুফরি অনুসারে দ্বিগুণ শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ বলবেন, **'কিন্তু তোমরা জান না।'** অর্থাৎ উভয় দলের কোনো দলই জানে না, তারা ছাড়া অন্য দলের ওপর কী পরিমাণ শাস্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

- এরপর **'পূর্ববর্তীরা তাদের পরবর্তীদের বলবে, "আমাদের ওপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।"'** কারণ, তোমরা আমাদের পরে এসেছ। এরপর তোমাদের কাছে রাসূলদের পাঠানো হয়েছে। তোমাদের কাছে তাঁরা হক স্পষ্ট করেছেন, আমাদের গোমরাহি থেকে তোমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। আমাদের অনুসরণ-অনুকরণ না করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের কথায় কর্ণপাত না করে তোমরা গোঁ ধরে ছিলে। রাসূলের আনীত সত্যকে উপেক্ষা করে অন্ধভাবে আমাদের অনুসরণ করেছিলে। তো, আমরা তোমাদের চেয়ে আর বেশি কী ছিলাম? আমরা যেমন গোমরাহ হয়েছিলাম, তেমনি তোমরাও গোমরাহ হয়েছ। আমাদের মতো তোমরাও সত্যকে উপেক্ষা করেছ। তোমরা যেভাবে আমাদের মাধ্যমে গোমরাহ হয়েছ, একইভাবে আমরাও তো অন্যদের মাধ্যমে গোমরাহ হয়েছিলাম। **'কাজেই তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করো।'**

আল্লাহ তাআলার এই উপদেশ কতটা নিগূঢ় অর্থ বহন করে! কতটা গভীর অর্থবহ রাব্বুল আলামীনের এই নাসীহাহ! অন্তর সজীব করার জন্য এর চেয়ে উত্তম আর কী আছে! এ যেন আল্লাহ তাআলার পথের পথিকের হৃদয়ের কথা। যদিও গাফিলদের এ নিয়ে কোনো খবরই নেই।

দুর্ভাগা অনুসারীদের কথা

এটা তো গেল মুশরিকদের কথা। অনুসারী এবং অনুসৃত দু'দলই গোমরাহ। আরও এক শ্রেণী রয়েছে, যারা তাদের পূর্ববর্তীদের নীতি-আদর্শের উলটা পথে চলেও দাবি করে—তারা পূর্বসূরিদের অনুসারী। আসলে তারা মোটেই তাদের অনুসরণ করে না। আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলছেন,

إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟ وَرَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا۟ مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَٰلَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿١٦٧﴾

> ‘অনুসৃতরা যখন অনুসরণকারীদের থেকে দায়মুক্তির ঘোষণা করবে এবং আযাব প্রত্যক্ষ করবে ও তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অনুসারীরা তখন বলবে, “হায়, যদি আমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ দেওয়া হতো! তাহলে আমরাও তাদের থেকে দায়মুক্তির ঘোষণা দিয়ে দিতাম, যেমন তারা আমাদের থেকে দায়মুক্তি ঘোষণা করেছে।” এভাবেই আল্লাহ তাআলা তাদের কৃতকর্মগুলো তাদেরকে দেখাবেন, তাদেরকে অনুতপ্ত করার জন্য। আর তারা কস্মিনকালেও আগুন থেকে বের হতে পারবে না।’[৫৬]

মূলত এই অনুসৃত ব্যক্তিরা ছিলেন হিদায়াতপ্রাপ্ত। তাদের অনুসারীরা তাদের মত ও পথের বিপরীতে চলেও দাবি করত যে, তারা সেসব ব্যক্তিদের আদর্শের ওপরই আছে। তারা এও দাবি করত যে, ‘আমরা তাদের আদর্শের উলটা পথে চললে কী হবে, আমরা তো তাদেরকে ভালোবাসি! এই ভালোবাসার কারণেই আমরা পার পেয়ে যাব। কিন্তু কিয়ামাতের দিন দেখা যাবে, অনুসৃতরা এই অনুসারীদের থেকে দায়মুক্তির ঘোষণা দিয়ে দেবে। কারণ এরা আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে তাদেরকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছিল। আর ধারণা করেছিল, এই অভিভাবকরা তাদের উপকার করবে।

এই অবস্থাই হবে সেসব লোকের, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পরিবর্তে অন্যদেরকে অভিভাবক বানিয়ে নেয়। তাদের খাতিরেই বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা করে। তারা সন্তুষ্ট এবং ক্রুদ্ধও হয়ে থাকে এই অভিভাবক আর বন্ধুদের স্বার্থেই। এই লোকদের সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যাবে। কিয়ামাতের দিন তাদের আমলের সংখ্যা বেশি দেখা যাবে, পরিশ্রম হবে অনেক, তবুও এসব তাদের আক্ষেপের কারণ হবে। কারণ তারা নিজেদের বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা, ভালোবাসা এবং ঘৃণা, জয় এবং অগ্রাধিকার—আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য করেনি। তাই আল্লাহ তাআলা সমস্ত আমল বাতিল করে দিয়ে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবেন। দুনিয়াতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য করা কোনো সম্পর্কই বহাল থাকবে না। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।’

কিয়ামাতের দিন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য করা সব ধরনের সম্পর্ক, মাধ্যম এবং ভালোবাসা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক জুড়ে দেয়, এমন সম্পর্কই কেবল সেদিন বহাল থাকবে। যেমন : আল্লাহ ও রাসূলের দিকে

[৫৬] সূরা বাকারাহ, ২ : ১৬৬-১৬৭

হিজরত, কেবল আল্লাহর জন্য করা ইবাদাত ইত্যাদি। এর জন্য আবশ্যকীয় বিষয় হলো—ভালোবাসা এবং ঘৃণা, প্রদান করা এবং বিরত থাকা, শত্রুতা এবং মিত্রতা, নৈকট্য এবং দূরত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে শুধু রাসূলের অনুসরণ করা এবং অন্য কারও কথা বর্জন করা। রাসূল ﷺ আনীত শারীয়াতের বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকা এবং যারা তা করে তাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা। অন্য কারও দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে শুধু তাঁরই অনুসরণ করা। তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরিক না করা বা অন্য কারও কথাকে তাঁর কথার ওপর প্রাধান্য না দেওয়া।

এটা হলো চিরস্থায়ী সম্পর্ক। বান্দার সাথে রবের সম্পর্ক এটাই। এটাই প্রকৃত বান্দার পরিচয়। এই বন্ধন এদিক-সেদিক ঘুরে, তারপর তার দিকেই ফিরে আসে। এই সম্পর্কই বান্দার উপকার করে। এটা ছাড়া দুনিয়া, কবর এবং আখিরাতে এমন কিছু নেই, যা বান্দার উপকার করতে পারে। এই সম্পর্কই বান্দার ভরসা, আশ্রয়, নিয়ামাত এবং সফলতার কেন্দ্র। এটাই বান্দার সাথে আল্লাহর অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক।
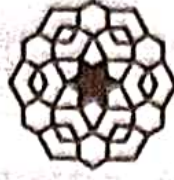
সৌভাগ্যবান অনুসারীদের কথা

যে সম্পর্ক কিয়ামাতের দিন বহাল থাকবে

কিয়ামাতের দিন মানুষের সাথে মানুষের যত ধরনের সম্পর্ক আছে, তার সবগুলো আল্লাহ তাআলা বিচ্ছিন্ন করে দেবেন। থাকবে কেবল বান্দা এবং আল্লাহ তাআলার সম্পর্ক। সেটা হলো স্রেফ দাসত্বের সম্পর্ক। এটা অস্তিত্বে আসার জন্য প্রয়োজন কেবল রাসূলগণের নিরঙ্কুশ অনুসরণ। কারণ, এই দাসত্বের কথা তো তাঁদের মুখেই উচ্চারিত হয়েছে এবং তাঁদের মাধ্যমেই পরিচিতি লাভ করেছে। কাজেই, তাঁদেরকে অনুসরণের মাধ্যমেই কেবল সেটা অর্জন করা সম্ভব। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا ﴿٢٣﴾

'আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, তারপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণা করে দেবো।'[৫৭]

এগুলো হবে এমন সব কাজ, যা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য করা হয়নি। বরং রাসূলগণের বাতলে দেওয়া পদ্ধতির বাইরে গিয়ে করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণা বানিয়ে দেবেন। আমলকারী সেই আমলের দ্বারা মোটেও উপকৃত হবে না। কিয়ামাতের দিন বান্দার জন্য এটাই সবচেয়ে বড় আক্ষেপের কারণ হবে, যখন সে দেখবে যে তার সব প্রচেষ্টা ধুলিস্যাৎ হয়ে গেছে; কোনোটাই কাজেই আসেনি। অথচ সে তখন আমলের প্রতি সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী থাকবে। সত্যিকারের প্রচেষ্টাকারীরাই তখন তাদের চেষ্টা দ্বারা উপকৃত হবে।

সৌভাগ্যবান অনুসারীরা দুই ধরনের।

১. সাহাবি এবং নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণকারী,

২. ঈমানদার অনুসারীদের সন্তানসন্ততি।

[৫৭] সূরা ফুরকান, ২৫ : ২৩

১. সাহাবি এবং নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণকারী

এক ধরনের অনুসারীরা হচ্ছে স্বাধীন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ

'মুহাজির ও আনসারদের মাঝে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে।'[৫৮]

এই সৌভাগ্যবানদের জন্য আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি সাব্যস্ত হয়ে গেছে। এঁরা হলেন নবি ﷺ-এর সাহাবি এবং নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণকারীগণ। এ কথার মাধ্যমে কিয়ামাত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁদেরকে অনুসরণ করবে, সবাই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। যারা শুধু আনসার এবং মুহাজিরদের যুগ দেখেছেন, শুধু তাদের কথাই বলা হয়নি। বরং পরবর্তীদের থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করার জন্য পারিভাষিক অনুসারীদের কথা বলা হয়েছে। অবশ্য কারও কারও মতে আয়াতে অনুসারীদের কথা বলে শুধু বিশেষ দলকে বুঝানো হয়েছে। নাহলে যারাই তাঁদের অনুসরণ করবে, তারাই নিষ্ঠার সাথে অনুসারী হয়ে যাবে। **'আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট'** এ কথা তাদের সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

আল্লাহ তাআলা এখানে অনুসরণের শর্তারোপ করেছেন 'নিষ্ঠার সাথে' বলে। এর দ্বারা বোঝা যায়, এটা সাধারণ কোনো অনুসরণ নয়। কেবল তাঁদের সম্পর্কিত হওয়া এবং তাদের শত্রুদের বিরোধিতা করার দ্বারাই এটা পূর্ণ হয় না। বরং অনুসরণ যখন নিষ্ঠার সাথে হবে, তখনই সেটা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং জান্নাত লাভের কারণ হবে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّۦنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا۟ بِهِمْ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٣﴾ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٤﴾

[৫৮] সূরা তাওবা, ৯ : ১০০

'তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাঁদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে। এবং (এই রাসূল প্রেরিত হয়েছেন) তাদের অন্যান্যের জন্যও, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন। আল্লাহ তো মহা অনুগ্রহশীল।'[৫৯]

এখানে প্রথম দলটি হলেন যারা আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে পেয়ে তাঁর সংস্রব গ্রহণ করেছেন। আর **'যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি'**—এই অংশটুকুর দ্বারা সেসব লোকদের কথা বলা হয়েছে, যারা কিয়ামাত পর্যন্ত তাঁদের অনুসরণ করবেন। তাদের পেছনে থাকা এবং পূর্ববর্তীদের সাথে মিলিত না হতে পারার কারণ হলো সময়গত তফাত। আরেকটি ব্যাখ্যা হলো, যারা সম্মান ও স্তরের ক্ষেত্রে প্রথম দলের সাথে মিলিত হতে পারেনি; বরং তারা নিচের স্তরে রয়েছে। এ ব্যাখ্যা অনুসারে দ্বিতীয় দলের মিলিত না হওয়ার কারণ হলো স্তরগত পার্থক্য।

এই দুটি বক্তব্যই একটি অপরটির সাথে সংযুক্ত। কারণ দুটি দলেরই একটি থেকে অপরটির মর্যাদাগত যেমন তফাত রয়েছে, তেমনই সময়গত পার্থক্যও আছে। মোটকথা উভয় দলই সৌভাগ্যবান। আর যারা রাসূলকে দিয়ে আল্লাহ তাআলার প্রেরিত হিদায়াত গ্রহণ করেনি, এমনকি সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করেনি, তারা তৃতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পরের আয়াতে বলেছেন,

ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا

'যাদেরকে তাওরাত দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা তার অনুসরণ করেনি।'[৬০]

নবির দাওয়াতে সাড়া দেওয়া হিসেবে মানুষের প্রকারভেদ

আল্লাহ তাআলা যে দাওয়াত এবং হিদায়াত দিয়ে নবিজিকে পাঠিয়েছেন, তার সাথে আচরণের ভিত্তিতে মানুষের প্রকারের বর্ণনা নবি ﷺ নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا،

[৫৯] সূরা জুমুআ, ৬২ : ২-৪

[৬০] সূরা জুমুআ, ৬২ : ৫

فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قَبِلَتِ الْمَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ

'আল্লাহ তাআলা আমাকে যে হিদায়াত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হলো যমিনে পতিত বৃষ্টির মতো। কোনো কোনো যমিন থাকে উর্বর, যা সেই পানি শুষে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে ঘাসপাতা এবং সবুজ তরুলতা উৎপাদন করে। আর কোনো কোনো যমিন থাকে কঠিন, যা পানি আটকে রাখে। পরে আল্লাহ তাআলা তা দিয়ে মানুষের উপকার করেন; তারা নিজেরা তা পান করে, (পশুপালকে) পান করায় এবং তার দ্বারা চাষাবাদ করে। আবার কোনো কোনো যমিন আছে যা একেবারে মসৃণ ও সমতল; তা না পানি আটকে রাখে, আর না কোনো ঘাসপাতা উৎপাদন করে। এই হলো সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং আল্লাহ তাআলা আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তা দ্বারা সে উপকৃত হয়। ফলে সে নিজে শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। আর সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে কিনা সেদিকে মাথা তুলে তাকায়ই না এবং আল্লাহ (প্রদত্ত) যে হিদায়াত নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তা গ্রহণও করে না।'[৬১]

হাদীসের ব্যাখ্যা

- এ হাদীসে নবি ﷺ ইলমকে বৃষ্টির সাথে তুলনা দিয়েছেন। কারণ বৃষ্টি এবং ইলম, দুটিই জীবন লাভের কারণ। বৃষ্টির মাধ্যমে শারীরিক জীবন লাভ হয়, আর ইলমের মাধ্যমে লাভ হয় অন্তরের জীবন।

- ইলম গ্রহণকারী অন্তরকে বৃষ্টির পানি ধারণ করতে পারে এমন যমিনের সাথে তুলনা করেছেন। যেমন কুরআন কারীমে উপত্যকার সাথে অন্তরের তুলনা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا

[৬১] সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৭৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২২৮২

'তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। ফলে উপত্যকাগুলো তাদের পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয়।'[৬২]

বৃষ্টির পানি ধারণ করার দিক থেকে যমিন তিন ধরনের।

ক. ঘাসপাতা এবং তরুলতা উৎপাদনকারী : এ ধরনের জমিতে বৃষ্টি পড়লে তা সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে। এটা হলো পবিত্র এবং বুদ্ধিমান অন্তরের দৃষ্টান্ত। বুদ্ধিমত্তা থাকায় তা গ্রহণ করে ইলম। পবিত্রতা থাকায় প্রজ্ঞা এবং দ্বীনের সততার কারণে তা সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়। এই অন্তর যেমন ইলমের উপযোগী, তেমনি ইলমের সুপরিণাম, গভীরতা এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্যের আধার। এই অন্তর হলো বিচক্ষণ ধনী ব্যবসায়ীর মতো, যার অনেক ধরনের ব্যবসা ও উপার্জনের মাধ্যম আছে। তিনি সম্পদ দিয়ে ইচ্ছেমতো মাল কামাই করেন।

খ. কঠিন ভূমি : পানি আটকে এবং সংরক্ষণ করে রাখে। এটা এমন অন্তরের উদাহরণ, যা ইলম সংরক্ষণ করে থাকে। যেমন শ্রবণ করে, তেমনই সংরক্ষণ করে থাকে। সে ইলমের কোনো ধরনের চর্চা বা তা থেকে কোনো মাসআলা আহরণ সে করে না। বরং তার কাজ হলো শুধু সংরক্ষণ করা এবং যেভাবে শুনে হুবহু সেভাবে অপরজনের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এ প্রকার সম্পর্কে নবি ﷺ অন্য জায়গায় বলেছেন,

فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ

'জ্ঞানবাহক অনেকেই তার চেয়ে বড় জ্ঞানীর কাছে জ্ঞান পৌঁছে দিতে পারে। অনেক জ্ঞানবাহক ব্যক্তি নিজে প্রজ্ঞাবান নয়।'[৬৩]

এই অন্তর ধনী ব্যক্তির মতো, যার কামাইয়ের অভিজ্ঞতা নেই। তিনি শুধু সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারেন, কিন্তু খরচের পদ্ধতি তার জানা নেই।

গ. মসৃণ ও সমতল : এই যমিন কোনো রকম ঘাসপাতা উৎপাদন করে না, পানিও আটকে রাখে না। পতিত যমিন, যাতে না আছে ঘাসপাতা, আর না আছে পানি আটকে রাখার ক্ষমতা। বৃষ্টির দ্বারা এ ধরনের যমিনের কোনো রকম উপকার হয় না। এটা হলো এমন অন্তরের মতো, যাতে কোনো রকম ইলম নেই। তার অবস্থা এমন হতদরিদ্র ব্যক্তির ন্যায়, যার না আছে সম্পদ, আর না আছে সম্পদ সঞ্চয়

---

[৬২] সূরা রা'দ, ১৩ : ১৭

[৬৩] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ২১৫৯০; আবু দাউদ, হাদীস নং : ৩৬৬০; তিরমিযি, ২৬৫৬

করার ক্ষমতা।

- ⇨ প্রথম প্রকার ব্যক্তি হলেন জ্ঞানী, শিক্ষক এবং দূরদর্শিতাসম্পন্ন দাঈ। তিনিই নবিগণের উত্তরাধিকারী।
- ⇨ দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তি হচ্ছেন যিনি সংরক্ষণ করেন এবং যা শোনা জিনিস যথাযথভাবে অন্যের কাছে পৌঁছে দেন। তিনি এমন ব্যক্তির মতো, যে অন্যকে ব্যবসার জন্য মূলধন দিয়ে থাকে এবং লাভবান হয়।
- ⇨ তৃতীয় প্রকার ব্যক্তির প্রথম কিংবা দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তির মতো কোনো যোগ্যতা নেই। সে আল্লাহ তাআলার দেওয়া হিদায়াত গ্রহণ করা তো পরের কথা, সেদিকে ভ্রুক্ষেপই করে না।

মোটকথা, এই হাদীসটি নববি দাওয়াতের আঙ্গিকে মানুষের প্রকার এবং তাদের স্তরগত বিন্যাস অনুপুঙ্খরূপে ফুটিয়ে তুলেছে।

২. সৌভাগ্যবান মানুষের দ্বিতীয় প্রকার

সৌভাগ্যবানদের দ্বিতীয় প্রকার হলো ঈমানদার অনুসারীদের সন্তানসন্ততি। দুনিয়াতে তারা শারীয়াতের বিধানাবলি পালনের উপযুক্ত হয়নি। তারা মূলত তাদের পূর্বপুরুষের অনুগামী হিসেবেই তাদের অনুসারী। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْءٍ ۚ كُلُّ ٱمْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾

'যারা ঈমান আনে এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সঙ্গে আমি মিলিয়ে দেবো তাদের সন্তানসন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্রও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী।'[৬৪]

এখানে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিচ্ছেন—তিনি মুমিনদের সন্তানদেরকে ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের পূর্বপুরুষদের সাথে মিলিত করে দিয়েছেন। পাশাপাশি জান্নাতেও তাদেরকে একত্র করে দেবেন। যদিও সেই স্তরে পৌঁছার উপযুক্ত হওয়ার মতো আমল সন্তানদের নেই। আল্লাহ তাআলা বলছেন, **'তাদের কর্মফল আমি**

[৬৪] সূরা তূর, ৫২ : ২১

কিছুমাত্রও হ্রাস করব না।'

অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের আমল না কমিয়েই সন্তানদেরকে আমি পূর্বপুরুষদের স্তরে উন্নীত করে দেবো এবং তাদের প্রতিদান পুরোপুরি দেওয়া হবে। আর সন্তানদের অবস্থাও এমন হবে না যেন তাদের আমলই নেই, বরং তারাও পূর্ণ প্রতিদান লাভ করবে। তাদের নিজেদের স্তর থেকে উন্নীত করে তবেই তাদেরকে আমি পূর্বপুরুষদের সাথে মিলিয়ে দেবো।

আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ

এরপর আল্লাহ তাআলা এটা বুঝিয়ে দিলেন যে, সাওয়াব এবং স্তরগত সমতা, এটা কেবলই তাঁর অনুগ্রহ। কারণ কারও মনে এমনটা ধারণা আসতে পারে যে, নেক কাজের কারণে ইনসাফ করে মনে হয় সন্তানদের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনটাও মনে হতে পারে যে, পূর্বপুরুষরা পাপ করলে সন্তানরাও বোধহয় তাদের শাস্তির ভাগীদার হবে। আসলে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের কৃতকর্মের জন্য দায়ী, অন্য কেউ তার সাথে সম্পৃক্ত হবে না। উল্লিখিত যুক্তকরণ হবে কেবল আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ এবং সাওয়াবের ক্ষেত্রে। শাস্তিপ্রদানের ক্ষেত্রে নয়। কুরআন কারীমের এমন আরও কিছু গুপ্তভাণ্ডার রয়েছে, যার বুঝ ও সমঝ আল্লাহ তাআলা নিজের মনোনীত ব্যক্তিদের দান করে থাকেন।

এ ধরনের আয়াতগুলোতে সমস্ত মানুষের প্রকার, সৌভাগ্যবান-দুর্ভাগা এবং তাদের অনুসারীদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং জ্ঞানী ও নিজের প্রতি কল্যাণকামী লোকদের উচিত নিজের অবস্থা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা যে, সে কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হতে যাচ্ছে। নিজের অভ্যাসের প্রতি ধোঁকায় পড়ে গিয়ে নিজেকে বীর বাহাদুর ভাবতে থাকা উচিত হবে না। নিজেকে সৌভাগ্যবানদের কাতারে দেখতে পেলে আরও উন্নতি করার প্রয়াস চালাতে হবে। আল্লাহ তাআলা তাওফীক এবং সফলতা দান করবেন। আর দুর্ভাগাদের দলভুক্ত দেখতে পেলে সময় থাকতে থাকতেই সৌভাগ্যবানদের কাতারে চলে আসার চেষ্টা করতে হবে। তা না হলে কুরআনের ভাষায় আক্ষেপ করে বলতে হবে, **'হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম!'**[৬৫]

[৬৫] সূরা ফুরকান, ২৫ : ২৭

সবচেয়ে বড় সহযোগিতা

নেক কাজ, তাকওয়া এবং আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূলের দিকে হিজরত করার জন্য হাত তথা কাজের মাধ্যমে, মুখ তথা নির্দেশনা দিয়ে এবং অন্তর তথা ভালোবাসা দিয়ে সাহায্য করাটাই সবচেয়ে বড় সহযোগিতা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার বান্দাদের এভাবে সহযোগিতা করবে, আল্লাহ সব কল্যাণকে তার দিকে ফিরিয়ে দেবেন। মানুষের অন্তরে সে ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসার সঞ্চার হবে। তার অন্তরে ঢেলে দেবেন সব ধরনের ইলম এবং সব কঠিন কাজ সহজ হয়ে যাবে তার জন্য। পক্ষান্তরে এর বিপরীত কাজ যে করবে, আল্লাহর তরফ থেকে সে বিপরীতটাই ভোগ করবে। কারণ আল্লাহ্ নিজেই নিজের সম্পর্কে বলেন,

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾

'আপনার পালনকর্তা বান্দাদের প্রতি মোটেই যুলুম করেন না।'[৬৬]

[৬৬] সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৪৬

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে সফরের পাথেয়

১. ইলম

এখন কেউ এই গুরুত্বপূর্ণ সফরের পাথেয়, পদ্ধতি এবং বাহন সম্পর্কে জানতে চাইলে উত্তরে বলা হবে, এই সফরের পাথেয় হলো শেষ নবি ﷺ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ইলম। এ ছাড়া অন্য কোনো পাথেয় নেই। কারও যদি এ পাথেয় না থাকে, তবে তার উচিত সফর না করে ঘরে বসে থাকা। 'আমার মতো তো অনেকেই আছে' এ কথা বলে কিয়ামাতের দিন সে মুক্তি পেয়ে যাবে, ব্যাপারটা কিন্তু এমন না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلۡيَوۡمَ إِذ ظَّلَمۡتُمۡ أَنَّكُمۡ فِي ٱلۡعَذَابِ مُشۡتَرِكُونَ ۝٣٩

'আর আজ তোমাদের (এই অনুতাপ) তোমাদের কোনো কাজেই আসবে না। তোমরা যেহেতু সীমালঙ্ঘন করেছিলে; (অতএব) তোমরা সবাই শাস্তিতে অংশীদার।'[৬৭]

২. কঠোর চেষ্টা-সাধনা

দুনিয়ার মুসিবত ব্যাপক আকার ধারণ করলে বিপদগ্রস্তরা একে অপরের থেকে সান্ত্বনা লাভ করে। যেমন আরবের এক প্রসিদ্ধ কবি খানসা, তার ভাই যুদ্ধে মারা যাওয়ার কারণে একটি মর্সিয়া রচনা করেন। তাতে তিনি বলেন, 'আমার চারপাশে ভাইহারাদের আহাজারি না থাকলে আমি আত্মহত্যা করে বসতাম। কিন্তু আমার মতো তারাও ভাই হারিয়ে কান্নাকাটি করছে দেখে আমি সান্ত্বনা পাচ্ছি।'

কিয়ামাতের দিন বান্দার অবস্থা এমন থাকবে না। সবাই আযাবের অংশীদার হওয়া সত্ত্বেও কেউ কারও থেকে সান্ত্বনা পাবে না। তাই, এই সফরের জন্য নিজের সবটুকু সাধ্য এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয় করতে হবে। শুধু স্বপ্ন আর সাধ দিয়ে এই

---

[৬৭] সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৩৯

সফর পার করা সম্ভব নয়। এ জন্য দুটি বিষয় লক্ষ রাখা প্রয়োজন।

প্রথমত, সত্যের ক্ষেত্রে কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরওয়া করা যাবে না। কারণ তিরস্কার এমন এক বিষয়, যার কারণে দক্ষ অশ্বারোহীও ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খায়।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তাআলার পথে হীন আর তুচ্ছ মনে করতে হবে নিজেকে। তাহলেই বিপদ-আপদকে ভয় না করে সামনে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। কারণ, মানুষ নিজের ব্যাপারে শঙ্কা বোধ করলেই পিছু হটে এবং যমিনে স্থায়ী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে।

৩. ধৈর্যশক্তি

আর এ দুটি বিষয়ের জন্য চাই ধৈর্যশক্তি। সামান্য সবর করলেও দেখা যাবে—ভয়াবহ বিপদ মৃদুমন্দ বায়ুর মতো অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করছে। একসময় দেখা যাবে, বিপদই তার সেবক এবং সহচরে পরিণত হয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকলে বিষয়টি বোঝা বড় দায়।

৪. আল্লাহ তাআলার আশ্রয়

এই সফরের বাহন হলো অন্য সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করা। নিজের অভাব আর প্রয়োজন প্রকাশ করে কাকুতি মিনতির মাধ্যমে সাহায্য চাইতে থাকা। তাঁরই ওপর ভরসা রাখা। ভাঙা এবং খালি বোতল যেমন পড়ে থাকে, আল্লাহ তাআলার সামনে সেভাবে পড়ে থেকে সাহায্য চাওয়া। যেন তিনি অনুগ্রহ করেন এবং ক্ষমার চাদরে আবৃত করে নেন। আশা করা যায়, এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা হিদায়াত দান করবেন এবং এই হিজরতের পথে থাকা নানান গুপ্ত রহস্য এবং ঘাঁটিগুলো উন্মোচিত করে দেবেন।

৫. কুরআনের তাদাব্বুর

মূলকথা হলো, এজন্য প্রয়োজন সার্বক্ষণিক ফিকির এবং কুরআনের আয়াত নিয়ে তাদাব্বুর তথা চিন্তাভাবনা করা। যাতে মস্তিষ্কে সব সময় কোশেশ চলতে থাকে এবং অন্তর যেন ব্যস্ত থাকে। মন-মস্তিষ্ক যখন এই ফিকিরে ছেয়ে যাবে এবং সব অবস্থায় কুরআনের দ্বারস্থ হওয়া অভ্যাসে পরিণত হবে, ঈমান তখন হৃদয়ের মাঝে পাকাপোক্ত আসন গ্রহণ করবে। সে ব্যক্তির চালচলন হবে ঈমানের মর্জিমাফিক।

সিরাতে মুস্তাকিমের ওপর চলা তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। ঈমানের আলোয় গোটা পথ সে পরিস্কার দেখতে পাবে। তাকে বাহ্যত স্থির মনে হলেও, সে বাতাসের সাথে প্রতিযোগিতা করবে।

وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِىَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ

‘আপনি পর্বতমালাকে দেখে স্থির মনে করছেন, অথচ (কিয়ামাতের দিন) এগুলো মেঘমালার মতো চলমান হবে।’[৬৮]

[৬৮] সূরা নামল, ২৭ : ৮৮

তাদাব্বুর করার পদ্ধতি

এখন পাঠক যদি বলেন যে, 'আপনি তো এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এ পথে অগ্রসর হওয়ার উপায় বাতলে দিন। আমাদের চোখের সামনে থেকে অজ্ঞতার পর্দা সরিয়ে দিন। বুঝিয়ে বলুন—কীভাবে কুরআনের তাদাব্বুর করতে হবে, কীভাবে আমরা কুরআনে থাকা ধনভাণ্ডারের সন্ধান পেতে পারি। বড় বড় মুফাসসিরগণের তাফসীর তো আমাদের সামনেই আছে। এরপরও কি কুরআনের অপ্রকাশিত কোনো দিক আমাদের সামনে নতুন করে উন্মোচিত হবে?'

উত্তরে আমি কয়েকটি উদাহরণ আপনার সামনে পেশ করব; যা অনুসরণের মাধ্যমে আপনি এ বিষয়ে দিকনির্দেশনা পেয়ে যাবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾ إِذْ دَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَقَالُوا۟ سَلَـٰمًا ۖ قَالَ سَلَـٰمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَـٰمٍ عَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُۥ فِى صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾ قَالُوا۟ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾

'আপনার কাছে ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? যখন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, সালাম। উত্তরে তিনি বললেন, সালাম। (ইবরাহীম মনে মনে ভাবল এরা তো দেখছি) অপরিচিত লোক। তারপর তিনি স্ত্রীর কাছে গেলেন এবং একটি মাংসল বাছুর ভাজা নিয়ে এলেন। সেটি তাদের সামনে রেখে তিনি বললেন, "তোমরা খাচ্ছ না কেন?" তখন তাদের সম্পর্কে তাঁর মনে ভয়ের সঞ্চার হলো। তারা বলল, "আপনি ভয় পাবেন না।" এরপর মেহমানরা তাঁকে একটি জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলো। তখন তাঁর স্ত্রী চিৎকার করতে করতে সামনে এলো এবং গাল চাপড়ে বলল, এক বৃদ্ধা, বন্ধ্যা! তারা বলল, "আপনার পালনকর্তা

এমনই বলেছেন। তিনি তো প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ।'''[৬৯]

আমি নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি, আয়াতগুলো অর্থসহ পড়লে আপনি জানতে পারবেন—কয়েকজন ফেরেশতা মেহমানের আকৃতিতে ইবরাহীম ﷺ-এর কাছে আসেন। তাঁরা ইবরাহীম ﷺ-কে একজন জ্ঞানী সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করেন। ইবরাহীম ﷺ-এর স্ত্রী এ কথা শুনে অবাক হয়ে গেলে ফেরেশতারা জানালেন যে, স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই এটা বলেছেন। সাধারণভাবে আয়াত থেকে কেবল এটুকুই আপনি বুঝতে পারবেন। এখন এই আয়াতগুলিতে থাকা কয়েকটি গুপ্ত রহস্য জেনে নিন :

- আয়াতগুলিতে ইবরাহীম ﷺ-এর কিছু প্রশংসা করা হয়েছে।
- শিক্ষা দেওয়া হয়েছে মেহমানদারির কয়েকটি নিয়ম।
- মেহমানের প্রতি লক্ষ রাখার পদ্ধতি শেখানো হয়েছে।
- বাতিল ফিরকাগুলোর মধ্যে যারা দর্শন নিয়ে মাতামাতি করে এবং যারা আল্লাহ তাআলাকে বেকার সাব্যস্ত করে, তাদের রদ করার পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে।
- নুবুওয়াতের সবচেয়ে বড় নিদর্শনটির (অর্থাৎ মুজিযার) কথা এসেছে।
- আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, ইলম এবং হিকমাত হলো সমস্ত গুণের পূর্ণতার আধার।
- পুনরুত্থান যে সম্ভব, তা এই আয়াতগুলি খুব সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত করে।
- পূর্ববর্তী অবিশ্বাসী জাতিসমূহের ওপর আল্লাহ তাআলার ইনসাফ এবং শাস্তি দানের কথা আছে এই আয়াতগুলোতে।
- ঈমান, ইসলাম এবং এ দুটির পার্থক্য নিয়ে আলোচনা আছে।
- আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহের অস্তিত্ব—তাঁর এককত্ববাদ, তাঁর রাসূলগণের সত্যতা বিচার-দিবসের প্রমাণ বহন করে।
- আয়াতগুলি একথা প্রমাণ করে যে, যার অন্তরে আখিরাতের শাস্তির ভয় আছে এবং এগুলোকে যে বিশ্বাস করে, সে-ই কেবল এসব দিয়ে উপকৃত

[৬৯] সূরা যারিয়াত, ৫১ : ২৪-৩০

হবে। পক্ষান্তরে যে আখিরাতের শাস্তিকে ভয় করে না, এবং আয়াতগুলিকে অবিশ্বাস করে, সেসব আয়াত তার কোনো উপকারে আসে না।

আয়াতগুলি নিয়ে নিবিড় ভাবনা

এখন এই আয়াতগুলির কিছুটা বিশদ আলোচনা দেখুন। আল্লাহ তাআলা প্রথমে বললেন,

هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾

'আপনার কাছে ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি?'

▪ ঘটনার গুরুত্ব বোঝানো

ঘটনাটি আল্লাহ তাআলা প্রশ্নের ধাঁচে শুরু করেছেন, যদিও প্রকৃতপক্ষে প্রশ্ন করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। এজন্যই কেউ কেউ বলেছেন, এসব ক্ষেত্রে প্রশ্নের আঙ্গিকে কথা বলা হলেও মূলত কথার নিশ্চয়তা বোঝানো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।[৭০] কিন্তু এভাবে প্রশ্নের আঙ্গিকে কথা বলার মাঝে একটি সূক্ষ্ম রহস্য ও চমৎকার অর্থ লুকিয়ে আছে। বক্তা যখন শ্রোতাকে এমন কোনো বিষয় বলতে চায় যা ভালোমতো মনোযোগ দিয়ে শোনা দরকার, তখন সে প্রথম কথাটা এমনভাবে বলে, যাতে শ্রোতা একটু নড়েচড়ে বসে। এ উদ্দেশ্যেই কখনও কখনও সতর্ক করার শব্দ ব্যবহার করে। আবার কখনও প্রশ্নের আঙ্গিকে কথা শুরু করে থাকে। কুরআনুল কারীমের অনেক জায়গাতেই এর ব্যবহার আছে। যেমন দেখুন,

هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ ﴿١٥﴾

'মূসার বৃত্তান্ত আপনার কাছে পৌঁছেছে কি?'[৭১]

وَهَلْ أَتَىٰكَ نَبَؤُا۟ ٱلْخَصْمِ

'আপনার কাছে কি বিবাদকারীদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে?'[৭২]

هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَٰشِيَةِ ﴿١﴾

'আপনার কাছে কিয়ামাতের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি?'[৭৩]

---

[৭০] তাবীলু মুশকিলিল কুরআন, পৃষ্ঠা নং : ৫৩৮
[৭১] সূরা নাযিআত, ৭৯ : ১৫
[৭২] সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ২১
[৭৩] সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ : ১

এসবের উদ্দেশ্য হলো, ঘটনার গুরুত্ব বোঝানো। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ঘটনা জানতে এবং সেসব নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করা। আরেকটি বিষয় হলো, নবি ﷺ-কে আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে বলছেন, এসব বৃত্তান্ত সম্পর্কে অবগত হওয়া আপনার নুবুওয়াতের সত্যতার অন্যতম নিদর্শন। কারণ, অদৃশ্যের এসব সংবাদ আপনি এবং আপনার সম্প্রদায়ের কেউই জানত না। সুতরাং আমি না জানালেও কি আপনি এটা জানতেন? নাকি আমি জানানোর পরই আপনি অবগত হয়েছেন?

কথাটি প্রশ্নের আঙ্গিকে করার কারণে অলংকারশাস্ত্রের মানে কেমন উন্নীত হয়েছে, পাঠক তা এবার ভেবে দেখুন।

▪ الْمُكْرَمِينَ শব্দটির অর্থ

ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ বলে আল্লাহ তাআলা তাঁর বন্ধু ইবরাহীমের প্রশংসা করেছেন। কারণ الْمُكْرَمِينَ শব্দটির দুটি অর্থ হতে পারে।

১. ইবরাহীম ﷺ মেহমান হিসেবে তাদের সম্মান করেছেন বলে তারা সম্মানিত। এ কথার মাধ্যমে ইবরাহীম ﷺ-এর আতিথেয়তা বুঝে আসে।

২. মেহমানরূপী ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার কাছে সম্মানিত। যেমন অন্য আয়াতে ফেরেশতাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۝٢٦

'বরং তারা তো (আল্লাহর) সম্মানিত বান্দা।'[৭৪]

এ অর্থ হিসেবেও আল্লাহ তাআলা তার খলীল ইবরাহীম ﷺ-এর প্রশংসা করেছেন। কারণ তিনি আল্লাহ তাআলার সম্মানিত বান্দাদের আতিথেয়তা করেছেন। মোটকথা, উভয় অর্থ বিবেচনায় আনলেও এটা মূলত ইবরাহীম ﷺ-এর প্রশংসা।

▪ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ –এর আলোচনা

আয়াতের এই অংশেও ইবরাহীম ﷺ-এর প্রশংসা করা হয়েছে। কারণ তিনি মেহমানদের অভিবাদনের জবাব তাদের চেয়েও সুন্দরভাবে দিয়েছেন। ফেরেশতারা তাঁকে অভিবাদন জানিয়েছিল ক্রিয়া-সূচিত বাক্য দ্বারা। পক্ষান্তরে ইবরাহীম ﷺ জবাব দিয়েছেন উদ্দেশ্য ও বিধেয় দ্বারা। আরবি ব্যাকরণের রীতি অনুযায়ী

[৭৪] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ২৬

উদ্দেশ্য ও বিধেয় দ্বারা গঠিত বাক্য স্থায়ী এবং বহমানতা প্রমাণ করে। পক্ষান্তরে ক্রিয়া-সূচিত বাক্যের চাহিদা হলো পুনঃপৌনিকতা। অতএব ইবরাহীম ﷺ-এর অভিবাদন বেশি সুন্দর এবং পূর্ণাঙ্গতর।

▪ মেহমানদারির নিয়ম

তারপর ইবরাহীম ﷺ বলেছেন,

قَوۡمٌ مُّنكَرُونَ ۝٢٥

'অপরিচিত লোক।'

এ কথায় মেহমানদেরকে চমৎকারভাবে সম্বোধনের পাশাপাশি লজ্জার ভাবও ফুটে ওঠেছে। এখানে প্রশংসার দুটি দিক রয়েছে।

প্রথমত, এখানে বাক্যের প্রথমাংশ উহ্য রাখা হয়েছে। সম্পূর্ণ বাক্যটির অর্থ হলো 'তোমরা অপরিচিত ব্যক্তি।' লজ্জা এবং অপছন্দনীয় বোধ থাকায় বাক্যের প্রথমাংশ তথা সম্বোধন উহ্য রাখা হয়েছে। ফলে কথার সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের নবি ﷺ-এর অভ্যাসও এমন ছিল। তিনি কাউকে সরাসরি অপছন্দনীয় কথা বলতেন না। বরং তিনি এভাবে বলতেন : লোকেরা এমন কেন বলে? এমন কেন করে?[৭৫]

দ্বিতীয়ত, ইবরাহীম ﷺ বলেছেন 'অপরিচিত লোক।' কিন্তু কার কাছে অপরিচিত, সেটা বলেননি। বাস্তবে মেহমানরা তাঁর কাছেই অপরিচিত ছিল। যেমন এ ঘটনা প্রসঙ্গেই আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেন,

نَكِرَهُمۡ

'তিনি অপরিচিত বোধ করলেন।'[৭৬]

এখানে 'আমি তোমাদেরকে চিনি না' বলার থেকে 'অপরিচিত লোক' বলা বেশি সুন্দর হয়েছে।

পরবর্তী আয়াত দুটিতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجۡلٖ سَمِينٖ ۝٢٦ فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيۡهِمۡ قَالَ أَلَا تَأۡكُلُونَ ۝٢٧

---

[৭৫] তিনি যে এভাবে বলতেন তা অনেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আগ্রহী পাঠক এজন্য সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৭৫০; ৬১০১; ৭৩০১ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৩৫৬ দেখতে পারেন।

[৭৬] সূরা হুদ, ১১ : ৭০

'তারপর তিনি স্ত্রীর কাছে গেলেন এবং একটি মাংসল বাছুর ভাজা নিয়ে এলেন। সেটি তাদের সামনে রেখে তিনি বললেন, "তোমরা খাচ্ছ না কেন?"'

এ আয়াত দুটিতে কয়েক রকমের প্রশংসা, মেহমানদারির নিয়ম এবং অতিথি আপ্যায়নের কথা আছে। প্রথমত আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ (তারপর তিনি স্ত্রীর কাছে গেলেন) : আল্লাহ তাআলা এখানে رَاغَ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যার মূল অর্থ হলো, দ্রুত এবং গোপনে যাওয়া। এ বাক্য থেকে বোঝা যায়, মেহমান আপ্যায়ন দ্রুত করতে হয়। আর গোপনে তড়িঘড়ি করার কারণ হলো, মেহমানকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচানো। অনেকেই এই ক্ষেত্রে ঢিলেমি করে। মেহমানের সামনে অলসতা প্রকাশ করে। তারপর মেহমানকে দেখিয়ে দেখিয়ে (আপ্যায়নের জন্য) বের হয়। মানিব্যাগ খুলে গুনে গুনে টাকা বের করে। মেহমান যেন দেখে, এমনভাবে জিনিসপত্র আনে। এসব দেখে মেহমান বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যায়। আয়াতে উল্লিখিত رَاغَ শব্দটি এর বিপরীত অবস্থা প্রকাশ করে।

▪ ইবরাহীম ﷺ ও তাঁর স্ত্রীর প্রশংসা

إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ (স্ত্রীর কাছে) : এটা বলে আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম ﷺ-এর আরেকটি প্রশংসা করেছেন। এটা থেকে বোঝা যায় যে মেহমানের আপ্যায়নের ব্যবস্থা তাঁর স্ত্রীর কাছে প্রস্তুত ছিল। এজন্য তাঁকে প্রতিবেশীর কাছে ধরনা দিতে হয়নি। কারণ তারা নিজেরাই আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

فَجَآءَ بِعِجۡلٖ سَمِينٖ (তখন একটি মাংসল বাছুর ভাজা নিয়ে এলেন) : এ অংশের মধ্যে তিন ধরনের প্রশংসা আছে।

১. অন্য কাউকে না পাঠিয়ে নিজেই মেহমানের সেবা করেছেন।

২. আংশিক না এনে গোটা প্রাণীটাই নিয়ে এসেছেন। যাতে মেহমান নিজের পছন্দমতো অংশ বেছে নিতে পারে।

৩. মোটাতাজা প্রাণী এনেছেন, শীর্ণকায় নয়। এটা ছিল উৎকৃষ্ট সম্পদ। মাংসল বাছুর। মেহমান পেয়ে তিনি খুশি হয়েছেন। তাই সম্মান প্রদর্শনের জন্য এমন দামি প্রাণী জবাই করে উপস্থাপন করেছেন।

فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيۡهِمۡ (সেটি তাদের সামনে রাখলেন) : এখানে একটি প্রশংসা এবং

মেহমানদারির একটি নিয়মের কথা বলা হয়েছে। সেটি হলো মেহমানের সামনে খাবার উপস্থিত করা। পক্ষান্তরে অনেকে ভিন্ন জায়গাতে খাবার প্রস্তুত করে। তারপর মেহমানকে সেখানে নিয়ে গিয়ে তার সামনে খাবার পরিবেশন করে থাকে।

قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (তিনি বললেন, তোমরা খাচ্ছ না কেন?) : এখানেও একটি প্রশংসা এবং মেহমানদারির একটি নিয়ম দেখানো হয়েছে। মেহমানের সামনে খাবার পরিবেশন করে তিনি খেতে অনুরোধ করছেন।

▪ পুত্রের সুসংবাদ

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً (তখন তাদের ব্যাপারে তাঁর মনে ভয়ের সঞ্চার হলো) : অর্থাৎ মেহমানরা খাচ্ছে না দেখে ইবরাহীম ﷺ উদ্বিগ্ন বোধ করলেন। কারণ মেহমান খাবার গ্রহণ করলে মেজবান নিশ্চিন্ত বোধ করে। ইবরাহীম ﷺ-এর উদ্বেগ বুঝতে পেরে ফেরেশতারা তাঁকে অভয় দিলেন এবং একজন জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ জানালেন। এই পুত্রটি ছিলেন ইসহাক, ইসমাঈল নয়। কারণ ইবরাহীম ﷺ-এর স্ত্রী সুসংবাদ শুনে আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, 'আমার মতো বৃদ্ধা-বন্ধ্যার সন্তান হবে কেমন করে?' আর ইসমাঈল ﷺ ছিলেন ইবরাহীম ﷺ-এর অন্য স্ত্রী হাজর ﷺ-এর গর্ভজাত। হাজর ﷺ ছিলেন কমবয়স্কা, আর ইসমাঈল ﷺ ছিলেন প্রথম সন্তান। সূরা হুদ-এ আল্লাহ তাআলা এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেছেন,

فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾

'তখন আমি তাকে ইসহাকের জন্মের সুখবর দিলাম এবং ইসহাকের পরে ইয়াকুবের।'[৭৭]

▪ মহিলাদের ব্যাপারে আলোচনা

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا (তখন তাঁর স্ত্রী চিৎকার করতে করতে সামনে এলো এবং গাল চাপড়াল) : এখানে মহিলাদের দুর্বল বুদ্ধিমত্তা এবং অস্থির চিত্তের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কারণ তিনি সংবাদটি শোনামাত্রই বিলাপ করা এবং গাল চাপড়ানো শুরু করেছিলেন।

وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (এবং বললেন, এক বৃদ্ধা, বন্ধ্যা!) : পুরুষের সাথে মহিলারা

---

[৭৭] সূরা হুদ, ১১ : ৭১

কথা বলার সময় প্রয়োজনীয় কথাটুকুই যে বলবে, তা চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ইবরাহীম ﷺ-এর স্ত্রী কথার উদ্দেশ্যটুকুই শুধু বলেছেন। বিধেয়টুকু এড়িয়ে গেছেন। 'আমি তো বৃদ্ধা-বন্ধ্যা। আমার কীভাবে সন্তান হবে?'—এমনটা তিনি বলেননি। সন্তান জন্ম দেওয়ার অক্ষমতার কারণটুকুই শুধু বলেছেন। অতিরিক্ত কিছু নয়। আর সূরা হুদ-এ এসেছে, তিনি নিজের এবং স্বামী ইবরাহীম ﷺ-এর অক্ষমতার কারণ বর্ণনা করে আশ্চর্য প্রকাশ করেছেন।

▪ আল্লাহ তাআলার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা

قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ (তারা বলল, 'আপনার পালনকর্তা এমনই বলেছেন।') : আল্লাহ তাআলা যে কথা বলেন, তা এই অংশটুকু দ্বারা সাব্যস্ত করা হয়েছে।

إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (তিনি তো প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ) : এখানে আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা সমস্ত সৃষ্টি এবং আদেশের উৎস। কারণ আল্লাহ তাআলা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, এর সবকিছুই তাঁর জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা থেকে প্রকাশ পেয়েছে। তদ্রূপ তাঁর আদেশ এবং বিধানেরও উৎস এই জ্ঞান ও প্রজ্ঞা।

জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা হলো সমস্ত পূর্ণতার আধার। জ্ঞান জীবনকে ধারণ করে। জীবনে পূর্ণতার সহজাত বৈশিষ্ট্য তথা সক্ষমতা, স্থায়িত্ব, শ্রবণ ক্ষমতা এবং দৃষ্টিশক্তি-সহ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের জন্য পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের প্রয়োজন।

আর প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ ইচ্ছাকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন ইনসাফ, দয়া, অনুগ্রহ, দান, সদাচার এবং প্রতিটি কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা। এছাড়াও রাসূল প্রেরণ করা এবং সাওয়াব ও শাস্তি দেওয়াও প্রজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।

এসব কিছু আল্লাহ তাআলার নাম 'হাকীম' থেকে জানা যায়। কুরআনিক পদ্ধতি হচ্ছে হিকমাতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার মহান উদ্দেশ্য প্রমাণ করার পাশাপাশি সেসব লোকদের রদ করা, যারা এটা দাবি করে যে সৃষ্টিজগতের সৃষ্টি সম্পূর্ণ অযথা ও উদ্দেশ্যহীন। কারণ আল্লাহ তাআলার হিকমাত থেকেই শারীয়াত, ভাগ্য, সাওয়াব এবং শাস্তি দান প্রমাণিত হয়। এজন্য বিশুদ্ধতম মত এটাই যে, বিবেকের মাধ্যমে পুনরুত্থান সম্পর্কে অবগতি লাভ হয়। আর শ্রবণশক্তি সম্পর্কে এতটা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে বিবেকের কাছে বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে যায়।

কুরআন কারীম নিয়ে কেউ চিন্তা-ভাবনা করলে, সে এমনটাই খুঁজে পাবে। আর আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য তাদের বোধগম্য বিষয়াদি দিয়েই উদাহরণ পেশ

করে থাকেন। যেগুলো পুনরুত্থান সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। তেমনি এই নির্ধারিত বিষয় সংঘটিত হওয়ার পেছনে প্রজ্ঞার দলিলও তিনি উল্লেখ করে থাকেন।

পুনরুত্থান নিয়ে কেউ ভাবলে, কুরআন থেকে যথেষ্ট দলিল খুঁজে পাবে। সাথে সাথে মানুষের অন্তরে উদিত সংশয়ের খণ্ডনও সে দেখতে পাবে। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দিলে, কুরআন কারীমের আরোগ্য, হিদায়াত, কার্যকারিতা, চমৎকার বর্ণনাশৈলী, সংশয়ের ব্যাপারে সতর্কতা, অন্তর প্রশান্তকারী উত্তর এবং দীপ্তিমান ইয়াকীন নিয়ে আমি যা কিছু দেখতে পেয়েছি, তা নিয়ে একটি বই লিখব।[৭৮] এখানে সেসব বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। মোটকথা, সব বস্তুর সৃষ্টিগত এবং আদেশগত উৎস হলো আল্লাহ তাআলার জ্ঞান এবং তাঁর প্রজ্ঞা।

▪ বন্ধা ও বৃদ্ধ পিতা-মাতা থেকে সন্তান আসা

উল্লিখিত আয়াতে এমন বাবা-মা থেকে সন্তান জন্মগ্রহণের কথা উঠে এসেছে, যাদের থেকে স্বাভাবিকভাবে সন্তান জন্ম নেয় না। এই অসাধারণ সন্তান জন্মগ্রহণের জ্ঞান আল্লাহ তাআলার কাছেই রয়েছে। আর এর পেছনে লুকিয়ে আছে প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়। এ জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা বোঝানোর জন্যই আল্লাহ তাআলার উল্লিখিত নাম দুটি ঘটনার মধ্যে আনা হয়েছে। কারণ এই সন্তান সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল। আর প্রজ্ঞার কারণে তিনি এই সন্তানকে যথাসময়ে ও যথাস্থানে সৃষ্টি করেছেন।

পরবর্তী কিছু আয়াতের তাদাব্বুর

এরপর আল্লাহ তাআলা লূত ﷺ-এর সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত ফেরেশতাদের কথা আলোচনা করেছেন।

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾ قَالُوٓا۟ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿٣٣﴾ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾

‘ইবরাহীম বলল, “হে প্রেরিত ফেরেশতাগণ, তোমাদের উদ্দেশ্য কী?” তারা বলল, “আমরা এক অপরাধী কওমের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। যাতে তাদের ওপর মাটির শক্ত ঢেলা নিক্ষেপ করি। যা আপনার রবের পক্ষ থেকে চিহ্নিত

[৭৮] লেখক এমন কিছু প্রমাণ এবং সেগুলোর ওপর আপত্তি উত্থাপন নিয়ে ই'লামুল মুকিঈন : ১/১৩৮-১৪৮-এ আলোচনা করেছেন।

সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য।’’’[৭৯]

তাঁরা এসেছিলেন অপরাধী কওমের প্রতি পাথর বর্ষণ করার জন্য। রাসূলগণকে সত্যায়ন করা এবং অবিশ্বাসীদের ধ্বংস করা এ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। পাশাপাশি পুনরুত্থান এবং (পরকালীন) সাওয়াব ও শাস্তির প্রমাণও এতে পাওয়া যায়। কারণ বিষয়টি এ দুনিয়াতেই প্রত্যক্ষভাবে সংঘটিত হয়েছে। রাসূলগণের সত্যতা এবং আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে তাঁরা যে সংবাদ দিয়েছিলেন, তার বিশুদ্ধতার এটা সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾

‘তারপর সেখানে যারা মুমিন ছিল, আমি তাদেরকে বের করে আনলাম। সেখানে একটি পরিবার ছাড়া কোনো মুসলমান আমি পাইনি।’[৮০]

কথার প্রয়োজনের তাগিদে আল্লাহ তাআলা এখানে ইসলাম এবং ঈমানের মাঝে পার্থক্য করেছেন। কারণ, বের করে আনা বলে আযাব থেকে উদ্ধার করা উদ্দেশ্য। আর এই উদ্ধার শুধু তাদেরই করা হয়েছে, যারা বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণভাবে রাসূলগণকে অনুসরণ এবং বিশ্বাস করে।

‘সেখানে একটি পরিবার ছাড়া কোনো মুসলমান আমি পাইনি।’ এ কথা বলার কারণ হলো, সেখানে থাকা লোকদের মধ্যে উদ্ধারকৃতদেরই কেবল মুসলমান বলা যায়। কারণ লূত ﷺ-এর স্ত্রীও সে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে বাহ্যিকভাবে মুসলমান ছিল। ঘরে থাকা লোকদের মধ্যে সে থাকলেও, মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে সে ছিল না। আল্লাহ তাআলা তার বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ জানিয়ে দিয়েছিলেন। তার বিশ্বাসঘাতকতা কেবল এটাই ছিল যে, সে লূত ﷺ-এর মেহমানদের সংবাদ সম্প্রদায়ের লোকদের জানিয়ে দিয়েছিল। আর মনে মনে সে তাদের সমর্থন করত। এটা কোনো বড় বিশ্বাসঘাতকতা নয়। তারপরও দেখা গেল যে, বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের তালিকায় তার নাম আছে বটে, কিন্তু মুক্তিপ্রাপ্ত মুমিনদের মধ্যে সে নেই। কুরআনুল কারীমের এমন সতর্ক শব্দপ্রয়োগ, রহস্য এবং বিচক্ষণতা নিয়ে

[৭৯] সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৩১-৩৪
[৮০] সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৩৫-৩৬

চিন্তা করলে যে-কারও টনক নড়ে যাবে। সাথে সাথে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এটা প্রজ্ঞাবান ও চিরপ্রশংসিত সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

এর মাধ্যমে ব্যাপকতর থেকে সাধারণতর কীভাবে আলাদা করা যায়, এ প্রসিদ্ধ প্রশ্নের জবাব এবং এর বিপরীতটা জানা যায়। এটাও স্পষ্ট হয় যে, সেখানে যারা উপস্থিত ছিল, তাদের থেকে মুসলমানদের বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে মুমিনদের বাদ দেওয়া হয়নি। বরং তারা হলো উদ্ধারকৃত এবং মুক্তিপ্রাপ্ত।

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَتَرَكْنَا فِيهَآ ءَايَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾

'যারা মর্মন্তুদ শাস্তিকে ভয় করে, তাদের জন্য আমি সেখানে একটি নিদর্শন রেখেছি।'[৮১]

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলা কিছু নিদর্শন রেখে দিয়েছেন, সেগুলো তাঁর এবং তাঁর রাসূলগণের সত্যতার প্রমাণ বহন করে। যারা পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহ তাআলার আযাবকে ভয় করে, তারাই কেবল সেগুলোর মাধ্যমে উপকৃত হয়ে থাকে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْءَاخِرَةِ

'যে আখিরাতের আযাবকে ভয় করে, এতে তো তার জন্য নিদর্শন আছে।'[৮২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ﴿١٠﴾

'যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে।'[৮৩]

এখন হয়ত আখিরাতে অবিশ্বাসকারীরা বলতে পারে, সেসব লোকেরা ওই যুগে দুর্যোগের শিকার হয়েছিল। আর সময়ের সাথে সাথে যুগের আবর্তন চলতে থাকে। বিপরীতে যারা আখিরাতকে বিশ্বাস করে এবং ভয় করে, তারাই নিদর্শন এবং উপদেশ দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকে।

---

[৮১] সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৩৭
[৮২] সূরা হুদ, ১১ : ১০৩
[৮৩] সূরা আ'লা, ৮৭ : ১০

এই-যে তাদাব্বুর, এসবের উদ্দেশ্য হলো উদাহরণ দিয়ে বোঝানো এবং কুরআন কারীম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন। পাশাপাশি এর রহস্য ও ধনভাণ্ডার উন্মোচনের ক্ষেত্রে চিন্তাগত পার্থক্যের ব্যাপারে সতর্ক করা। অন্যদেরও উচিত এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। বাড়তি অনুগ্রহ তো আল্লাহ তাআলার হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে থাকেন।

হিজরতের সফরসঙ্গী

অন্তর এ সফর করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলে তখন সে একজন উপযুক্ত সফরসঙ্গী খোঁজ করবে। কিন্তু তখন সে কেবল এমন সঙ্গীই পাবে, যে তার বিরোধিতা করে অথবা ভুলের জন্য স্পষ্টভাবে তিরস্কার করে, কিংবা এই আন্দোলন থেকে বিমুখ থাকে। সবাই এমন হলে ভালোই হতো। কারণ যে ব্যক্তি আপনার চলার পথে বাধা সৃষ্টি করে না এবং তার অনিষ্ট থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখে, সে মূলত আপনার প্রতি অনুগ্রহ করে থাকে।

মানুষের পক্ষ থেকে এটাই সদাচার। তবে এই যুগে সফরের ক্ষেত্রে মূল চাওয়া হলো, তিরস্কার ও আপত্তি না করার মাধ্যমে সহযোগিতা করা। সফরকারীর উচিত এই সুযোগের অপেক্ষায় বসে না থেকে, একাকীই সফর চালিয়ে যাওয়া। কারণ উদ্দিষ্ট বস্তু সন্ধানে একাই পথ চলতে থাকা, সে জিনিসের প্রতি ভালোবাসার সত্যতা প্রমাণ করে।

আমার পক্ষ থেকে উপহার

এই পাতা কয়টিতে আমি যা লিখেছি সেগুলো নিয়ে একটু চিন্তা করলেই যে-কেউ এটা লেখার হাকিকত বুঝতে পারবে। আমার উদ্দেশ্যও হলো—নেক কাজ, তাকওয়া এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত করার কয়েকটি পাথেয় যোগান দেওয়া। ইলম অর্জনের পথে আমার সতীর্থদের জন্য আমি তা আগাম উপহার হিসেবে পেশ করছি। আল্লাহ তাআলাকে সাক্ষী রেখে বলছি, তাদের কেউ এ উপহারটুকু পেলে অবশ্যই সেটা লুফে নেবে, তা অনুধাবন করতে চেষ্টা করবে এবং মনে করবে যে, এটা বন্ধুর প্রতি আরেক বন্ধুর শ্রেষ্ঠ উপহার। এটা ছাড়া সংবাদবাহক কাফেলা যেসব সংবাদ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, সেগুলোর উপকারিতা নিতান্তই সামান্য। কিন্তু মানুষ সেসবের প্রতিই আগ্রহী। সচরাচর উপভোগ্য বলে তা দামেও সস্তা। বাস্তবে কল্যাণকর উপহার তো প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা, যা এক মুসলমান অপর মুসলমান ভাইকে দিয়ে থাকে।

এই সফরে ইচ্ছুকদের করণীয়

এই সফর করতে চাইলে মৃত ব্যক্তিদের সান্নিধ্য গ্রহণ করা উচিত। কারণ জগতে প্রকৃতপক্ষে তারাই জীবিত। তাদের সান্নিধ্যে থেকেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব। মানুষের মাঝে যারা জীবিত, বাস্তবিক অর্থে তারা মৃত। তাদের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলতে হবে। এ পথের পথিকদের তথাকথিত 'জীবিত'দের সংস্পর্শের তুলনায় তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাটাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। এজন্যই সালাফে সালিহীনের অনেকে বলতেন, জীবিত লোকের সংস্পর্শে গিয়ে অন্তরের মৃত্যু ঘটানোর চেয়ে, মৃত লোকের সান্নিধ্যে অন্তর তরতাজা করা অনেক ভালো।

আত্মীয়-স্বজন এবং স্বজাতির লোকের মাধ্যমেই মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে। এদের কারণে তার দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী হয় না, তাদের সাথে নিজের মিল দেখে মনোবল হারিয়ে ফেলে এবং তারা যে পথে চলে, সেদিকে চলার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। এমনকি তারা সাপের গর্তে ঢুকলে, তাদের সাথে সেখানেও ঢুকতে পছন্দ করে।

ব্যক্তি হারিয়ে গেছে, কিন্তু পৃথিবী তার কীর্তি স্মরণ রেখেছে—এমন সব লোকের সান্নিধ্যে গেলে মনোবল উন্নত হয়। এর মাধ্যমে নতুন উদ্যম ও অভিনব কাজের সূচনা ঘটে। ব্যক্তি তখন প্রসিদ্ধ আর উচ্চ বংশীয় হলেও, গুরাবা হিসেবেই থাকতে চাইবে। তার অবস্থা মানুষ দেখবে না। কিন্তু সে ঠিকই সাধ্যের সবটুকু দিয়ে তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করবে। তাদের মাঝে দুই ধরনের দৃষ্টি নিয়ে চলবে। এক প্রকার দৃষ্টি থাকবে আদেশ এবং নিষেধের দিকে। এর মাধ্যমে সে মানুষকে আদেশ/নিষেধ করবে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব/শত্রুতা করবে এবং তাদের হক আদায় করবে যথাযথভাবে।

আরেক প্রকার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে আল্লাহ তাআলার ফায়সালা এবং নিয়তির দিকে। এর মাধ্যমে সে তাদের প্রতি দয়ার আচরণ করবে। তাদের জন্য দুআ-ইসতিগফার করবে। যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার আদেশ কিংবা শারীয়াতের বিধান লঙ্ঘন না হয়, এমন সব ক্ষেত্রে মানুষকে নানাভাবে অপারগ মনে করবে। মায়া, মমতা, নম্রতা এবং উদারতা দিয়ে মানুষকে সে ঘিরে রাখবে। নিম্নোক্ত আয়াতের সামনে সে স্থির হয়ে যাবে,

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

'ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং মূর্খদের

এড়িয়ে চলুন।'[৮৪]

এ আয়াতে মানুষের সঙ্গে সদাচার, তাদের হক আদায়, পাশাপাশি তাদের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে সে চিন্তাভাবনা করবে। সমস্ত মানুষই যদি এ আয়াত অনুসরণ করে, তবে সবাই উপকৃত হবে। কারণ ক্ষমা হলো চরিত্রের বাড়তি সৌন্দর্য, যার মাধ্যমে চারিত্রিক উন্নতি ঘটে। ক্ষমাশীল লোকের জন্য মানুষ জান-মাল ব্যয় করতে কোনো রকম কার্পণ্য করে না। এটা হলো মুসাফিরের প্রতি মানুষের আচরণ। আর মানুষের প্রতি মুসাফিরের আচরণ হবে তাদেরকে সৎকাজের আদেশ করা। সর্বোপরি এটাই আল্লাহ তাআলার আদেশ। আর মূর্খদের দেওয়া কষ্ট থেকে বেঁচে থাকা, তাদেরকে উপেক্ষা করা এবং নিজের খাতিরে প্রতিশোধ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা চাই। মানুষের জন্য এটাই সর্বোচ্চ সম্মান। দুনিয়াতে এটাই সর্বোত্তম জীবন যাপন পদ্ধতি। পৃথিবীর সব অনিষ্টের কারণ হলো, এই মৌলিক তিনটি আদেশ বা যে-কোনো একটি পালনে ত্রুটি। অপরদিকে মানুষ যত কল্যাণ লাভ করে, তার সবই এসব আদেশ পালন করার কারণে হয়ে থাকে।

অবশ্য কিছু কল্যাণ এমন আছে, যা বাহ্যিকভাবে অকল্যাণ বলে মনে হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ

'যারা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তো তোমাদেরই একটি দল। তোমরা একে নিজেদের জন্যে খারাপ মনে কোরো না; বরং এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণজনক।'[৮৫]

মন্দ আর কষ্টকর অবস্থাতেও এই কাজ কল্যাণের উৎস হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা নবি ﷺ-কে বলেছেন,

فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ

'কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। তারপর কোনো কাজের সংকল্প করলে, তখন আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করুন।'[৮৬]

এই আয়াতটিতে আল্লাহর হক এবং বান্দার হক—দুদিকেই লক্ষ রাখা হয়েছে। কারণ রাসূলের সামনে হাজির থাকা ব্যক্তিরা এমন কোনো কথা বা কাজ করে

---

[৮৪] সূরা আরাফ, ৭ : ১৯৯

[৮৫] সূরা নূর, ২৪ : ১১

[৮৬] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৫৯

ফেলতে পারেন, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলার অথবা আল্লাহর রাসূলের যথাযথ হক রক্ষা হবে না। নবি স.-এর সাথে এমনটা হয়ে গেলে, তাকে ক্ষমা করে দিতে বলা হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলার হকের ক্ষেত্রে এমনটা হয়ে গেলে, নবিকে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার পাশাপাশি তাদের হৃদয় আকর্ষণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ কাজের পদ্ধতি হিসেবে পরামর্শক্রমে তাদের মতামত গ্রহণ করতে বলেছেন আল্লাহ তাআলা। তাদের অনুগতশীল বানানো ও হিতকামনা করার এটাই সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতি।

(দ্বীনি) কোনো বিষয়ে সংকল্প করে ফেললে, এরপর কোনো পরামর্শ করার দরকার নেই; বরং আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করুন। আর সংকল্পবদ্ধ বিষয়ে অবিচল থাকুন। কারণ ভরসাকারীদেরকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন।

চরিত্র গঠনের নীতিমালা

চরিত্র গঠনের এমন সব নীতিমালা রাসূল ﷺ-কে আল্লাহ তাআলা শিক্ষা দিয়েছেন। আর তাঁর সম্পর্কে বলেছেন,

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝٤

'আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।'[৮৭]

আয়িশা رضي الله عنها বলেছেন, 'কুরআনই ছিল নবি ﷺ-এর চরিত্র।'[৮৮]

এই উন্নত চরিত্র লাভ করতে প্রয়োজন তিনটি বৈশিষ্ট্য।

১. ব্যক্তিত্ববান হওয়া। স্বভাব যদি রূঢ় এবং কর্কশ হয়, তাহলে উন্নত চরিত্রের জ্ঞান অর্জন করতে চাওয়া, এ সম্পর্কে আগ্রহী হওয়া এবং এর জন্য অনুশীলন করা কঠিন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে অনুগত এবং নম্র প্রকৃতি হলো চাষের উপযোগী যমিনের মতো।
২. প্রবৃত্তি এবং ভ্রষ্টতার বিপক্ষে শক্তিশালী এবং অপ্রতিরোধ্য হওয়া। কারণ প্রবৃত্তি এবং ভ্রষ্টতা হলো উৎকর্ষতার শত্রু। এখন ব্যক্তি যদি সেগুলোকে দমন করার মতো শক্তি না রাখে, তবে সে নিজেই পরাস্ত হতে থাকবে।
৩. বস্তুর স্বরূপ এবং স্তর সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখা। যাতে পার্থক্য করা যায়—কোনটা চর্বি, আর কোনটা টিউমার। কোনটা কাঁচ, আর কোনটা জহরত।

---

[৮৭] সূরা কালাম, ৬৮ : ৪
[৮৮] আল আদাবুল মুফরাদ : ৩০৮; সহীহ মুসলিম : ৭৪৬; ইবনে মাজাহ : ২৩৩৩

এই বৈশিষ্ট্য তিনটির পাশাপাশি আল্লাহ তাআলার দেওয়া তাওফীকও যদি লাভ হয়, তবে তো সোনায় সোহাগা। সে তখন ওই লোকদের দলভুক্ত হয়ে যাবে, যাদের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান নির্ধারিত করে রাখা হয়েছে এবং পরিপূর্ণ অনুগ্রহ করা হয়েছে।

সর্বশেষ কথা হলো, একমাত্র আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক করা, অন্য সবকিছুর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে অন্তরে একমাত্র তাঁকেই আসন দেওয়া এবং তাঁর কাছে ধরনা দিয়ে পড়ে থাকা। এই স্তরে পৌঁছতে পারলে বান্দা আল্লাহ তাআলার বিস্ময়কয় অনুগ্রহ দেখতে পাবে। সে দেখবে, আল্লাহ তাআলা কীভাবে বান্দার প্রতি রহম করেন এবং যাবতীয় অনিষ্ট থেকে দূরে রাখেন। পাশাপাশি অন্যান্য মানুষের অন্তরে সেই বান্দার প্রতি ভালোবাসা এবং দয়া সঞ্চার করে দেন।

কিন্তু আমরা বলি : হে আমাদের রব! আমরা অনেক তিরস্কার শুনছি। আমাদের মূর্খতা, অত্যাচার এবং অন্যায় অনেক বেড়ে গেছে। আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি, আমরা সীমালঙ্ঘন এবং কমতি করছি। লাঞ্ছিত আর ইতর লোকই কেবল এতকিছুর পর আপনার কাছে সুনাম দাবি করে। এখন আপনি যদি আমাদেরকে আমাদের হাতেই ছেড়ে দেন, তবে তো আপনি ধ্বংস ও পাপের মাঝে আমাদেরকে ছেড়ে দিলেন। আপনার সন্তুষ্টির জন্য আক্ষেপ করা ছাড়া আমাদের কোনো গতি থাকবে না। আপনি ছাড়া অন্য কারও ক্রোধের পরোয়া আমরা করি না। আপনার আনুগত্য, ভালোবাসা এবং আপনার সাথে থাকা সৎ সম্পর্কের ঊর্ধ্বে কাউকে স্থান দিই না।

শেষের তিনটি কথা

এই দীর্ঘ কথার পরিবর্তে তিনটি কথা এমন আছে, যা সহজেই মানসপটে অঙ্কন করে এবং প্রতিটি ক্ষণে মনে রাখা যায়। সালাফে সালেহীন সেসব কথা তাদের লেখা পত্রের মাঝে উল্লেখ করতেন। কথা তিনটি হলো,

১. যে ব্যক্তি নিজের অন্তরকে সংশোধন করে নেয়, আল্লাহ তার প্রকাশ্য অবস্থা সংশোধন করে দেন।

২. যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে তার নিজের মিলঝিল করে নেয়, আল্লাহ তাআলা মানুষের সাথে তার মিল করিয়ে দেন।

৩. যে ব্যক্তি আখিরাতের জন্য আমল করে, আল্লাহ তার দুনিয়ার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।

এসব পালনের তাওফীক একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছে। তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। তিনিই একমাত্র প্রতিপালক।

আমার লেখার ভুল-ত্রুটিগুলো আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করুন। এগুলো আসলে জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির দীর্ঘশ্বাসের মতো। এসব মানসিক চাপে জর্জরিত এক ব্যক্তির কথা, যার ভেতরটা তলে তলে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। কষ্টের সূচনা তার থেকেই এবং শেষও তারই মাঝে। কারও সাথে সে তা ভাগাভাগি করতে পারছে না। এই কষ্টের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ প্রভাব কেবল সে-ই ভোগ করে চলছে।

যে তোমাদেরকে ভালোবাসে,
সে তার থেকে দূরে থাকা লোকদের
প্রভাবিত করতে চাইছে এসব কথার মাধ্যমে।

প্রত্যেক ব্যথিত ব্যক্তিই এ জাতীয় কথাকে নিজের সাথে যুক্ত করে থাকে। উদ্দেশ্য থাকে—মানসিক প্রশান্তি লাভ করা। তবে এটা অরণ্যে রোদনের মতো। এতে কোনো লাভ নেই। কারণ অন্তর কেবল নিজের স্থানেই স্থিতি লাভ করে। নিজের

স্থান ছাড়া অন্য কারও জায়গাতে তা আসন গাঁড়তে পারে না। যেমন কোনো এক কবি বলেছেন, 'অন্তরকে অন্য কোনো স্থানে পাত্রবিহীন অবস্থায় রাখলে, তা বিনষ্ট হয়ে যায়।' কবির এ কথার অনেক মর্ম আছে। আমি অন্য এক জায়গায় তা লিখেছি।

মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পুরো সময়টাই একটা সফরের মতো। এ সফর অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের সফর। মহাকালের অতি ক্ষুদ্র এক পরিসরে এ জীবনের ব্যাপ্তি। চোখ খুলে যাত্রা শুরু, চোখ বুজে সমাপ্তি।

এ কারণেই মুসলিমদেরকে মুসাফিরের ন্যায় জীবনযাপন করতে বলা হয়েছে। সফরে আমরা যেমন অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া কোনোকিছু নিয়ে পেরেশান হই না, উদ্দেশ্য থাকে কেবলই গন্তব্যে পৌঁছানো—যাত্রা শেষ করা, তেমনি জীবনের এই সংক্ষিপ্ত সফরে আমাদেরও একটি চূড়ান্ত গন্তব্য রয়েছে। জান্নাত।

জান্নাতে পৌঁছানোর প্রয়োজনীয় রসদ জোগানোর জন্যই মূলত দুনিয়ায় আমাদের এই ক্ষুদ্র মুসাফিরি জীবন। ছোট্ট এই সফরে সৃষ্টি হিসেবে স্রষ্টার সাথে একটি সুন্দর সম্পর্কই আমাদের জন্য সর্বোত্তম পাথেয়। জান্নাতের মালিকের সাথে সম্পর্ক গড়ে জান্নাতের পাথেয় অর্জনের রূপরেখা আমাদের এই 'মুসাফিরের পাথেয়'। প্রায় ৭০০ বছর পূর্বে রচিত নুসুসভিত্তিক এক সংক্ষিপ্ত আখ্যান।

دار الفلاح
দারুল ফালাহ